পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা: পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নের সুরক্ষায় ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞানের ভূমিকা

LIVELIHOOD OF BIRHOR TRIBES IN PURULIA DISTRICT: A SOURCE OF INDIAN INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEM AND ITS ROLE FOR SUSTAINABILITY OF ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

THE SYNOPSIS

SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF EDUCATION JADAVPUR UNIVERSITY, KOLKATA FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ARTS (EDUCATION)

SUBMITTED

BY

SUNNY BASKEY

REGISTRATION NO: A00ED1301319

SUPERVISED BY

PROF. (Dr.) BISHNUPADA NANDA

DEPARTMENT OF EDUCATION

JADAVPUR UNIVERSITY

2025

সূচীপত্র (Contents)		
ক্রমিক সংখ্যা		পৃষ্ঠা সংখ্যা
	প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা **(Introduction)**	
১.১	আদিবাসী জীবনের প্রেক্ষাপট	১
১.২	আদিবাসীদের শ্রেণিবিভাগ	৪
১.৩	আদিবাসীদের জন্য সাংবিধানিক অধিকার	৪
১.৪	বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ	৫
১.৫	পুরুলিয়া জেলা হিসাবে সৃষ্টি হওয়ায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	৬
১.৬	পুরুলিয়া জেলার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট	১২
১.৭	পুরুলিয়া জেলার উৎসব সমূহ	৮
১.৮	পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার	৯
১.৯	পুরুলিয়া জেলার ভাষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস	১০
১.১০	পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায়	১০

	দ্বিতীয় অধ্যায়: সাহিত্য সম্পর্কিত পর্যালোচনা **(Review and Related Literature)**	
২.১	পর্যালোচনা এবং সাহিত্য	১২
২.২	জ্ঞানের ব্যবধান	১৭
২.৩	গবেষণার প্রশ্ন	২০
২.৪	উদ্দেশ্য সমূহ	২১
২.৫	অধ্যয়নের সীমাবদ্ধতা	২২
	তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণার পদ্ধতি **(Research Methodology)**	
৩.১	গুনগত এবং নৃতাত্ত্বিকগত গবেষণার নকশা	২৩
৩.২	পর্যবেক্ষণ	২৪
৩.৩	অংশগ্রহনমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (PRA)	২৪
৩.৪	ফোকাস দল আলোচনা	২৬
৩.৫	উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার	২৭
৩.৬	পুরুলিয়া জেলার তিনটি ব্লকের অধীনে চারটি গ্রামের পার্শ্বচিত্র	২৭

	চতুর্থ অধ্যায়: সংগৃহীত গুণগত তথ্য এবং বিশ্লেষণ **(Collection of Qualitative Data and its Interpretation)**	
৪.১	ভূপতিপল্লী, বাড়েরিয়া, বেড়সা এবং ডাকাই গ্রামের বিরহড়দের থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং ব্যাখ্যা	৩৩
	পঞ্চম অধ্যায়: বিরহড়দের ঐতিহাসিক পটভূমি **(Historical Background of Birhors)**	
৫.১	ভারতে বিরহড়দের সম্বন্ধে একটি সাধারণ ঐতিহাসিক পটভূমি	৪৮
৫.২	বিরহড়দের আদি বাসস্থান	৫২
৫.৩	বিরহড়দের শ্রেণীবিভাগ	৫২
৫.৪	বিরহড়দের প্রাত্যহিক জীবন	৫৪
৫.৫	বিরহড়দের সংস্কৃতি	৫৫
	ষষ্ঠ অধ্যায়: আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন **(Indigenous Knowledge and Sustainable Development)**	
৬.১	আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান	৫৭
৬.২	স্থিতিশীল উন্নয়ন	৬৫
৬.৩	স্থিতিশীল উন্নয়নের নৈতিকদিক সমূহ	৬৯

৬.৪	স্থিতিশীল উন্নয়নে বিরহড় আদিবাসীদের ভূমিকা	৭০
	সপ্তম অধ্যায়: গবেষণার ফলাফল এবং আলোচনা **(The Findings from Research and Discussion)**	
৭.১	গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল	৮১
৭.২	আলোচনা	৮৭
৭.৩	শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য	৯৭
৭.৪	পরবর্তী গবেষণার সুযোগ	১০১
৭.৫	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১০১
	গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)	১০৪

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

(INTRODUCTION)

১.১ আদিবাসী জীবনের প্রেক্ষাপট (Background of Indigenous Life):

ভারতবর্ষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। আর এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বহুত্বের ধারণা। এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ, গাছপালা, এবং পশুপাখি বসবাস করে যাদের প্রকৃতিও পরস্পর থেকে ভিন্ন। ভারতের এই বহুত্ব ও ভিন্নতা বর্ণময় হয়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠীর উপস্থিতিতে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রায় ৬৬৫ ধরনের আদিবাসী মানুষ ভারত ভূমিতে বসবাস করেন। আবার কারো কারো মতে ভারতবর্ষে প্রায় ৭০৫ রকমের আদিবাসী মানুষ রয়েছেন (Ministry of Tribal Affairs, 2014, p.34)। বিশাল দেশ ভারতবর্ষে এক ঘেয়ে জনজীবনের মধ্যে উদ্দীপনা দানকারী নতুন ধরনের ছোঁয়া লেগেছে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী মানুষদের উপস্থিতির জন্য। সকল ধরনের আদিবাসী মানুষের ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, জীবনর্চচা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য – যা একটি আদিবাসী গোষ্ঠীকে অন্য একটি আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। বিভিন্ন ধরনের আদিবাসীরা ভারত ভূমির বিভিন্ন পরিবেশে আধুনিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করেন। ভারত ভূমিতে আদিবাসীরা অ-আদিবাসী সমাজ থেকে এক পৃথক সত্ত্বা বিশিষ্ট সম্প্রদায়। ২০১১ সালে আদমশুমারি রিপোর্ট অনুসারে আদিবাসীদের জনসংখ্যা প্রায় ১০,৪২,৮১,০৩৪ জন যা ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৬ %। এই বিশাল সংখ্যক আদিবাসী মানুষজনের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন প্রায় ৯,৩৪,১১,১৬২ জন এবং শহর এলাকায় বসবাস করেন প্রায় ১,০৪,৬১,৮৭২ জন। গ্রামীণ মোট জনসংখ্যায় ১১.৩% হলেন বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী মানুষ এবং শহর অঞ্চলে এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২.৮%। ভারতবর্ষে প্রতি ১০০০ জন আদিবাসী পুরুষ

পিছু আদিবাসী মহিলার সংখ্যা ৯৯০ জন। আজও পর্যন্ত শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র পৃথিবীতেই আদিবাসী মানুষরা অ-আদিবাসী মানুষজনের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন। আদিবাসী মানুষ জনের এই পশ্চাৎপদতা তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলিতে অধিক। অপেক্ষাকৃত উন্নত রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়াতেও আদিবাসীরা তাঁদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা ইত্যাদির নিরিখে সাধারণ মানুষদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন এবং যে কোন রাষ্ট্রের দরিদ্রদের মধ্যেও এরা দরিদ্র। ভারতবর্ষে আদিবাসীরা এখনও প্রান্তিক জনজাতি বলেই স্বীকৃত (Ministry of Tribal Affairs, 2014, p.25), এমনকি একবিংশ শতাব্দীতেও ভারতের আদিবাসীদের একটি বড় অংশ দিনে তিন বেলা খাবার টুকুও সংগ্রহ করতে পারেননা।

যীশুখ্রিস্টের জন্মের ২৪০-২৪২ বছর পূর্বে ল্যাটিন শব্দ 'ট্রাইবাস' ('Tribus') বলতে বোঝাতো তিনটি গ্রামীণ আদিবাসী গোষ্ঠী- 'টাইটেস', 'র‍্যাম্নেস' এবং 'লুসেরস'। এই গোষ্ঠীর মানুষরা রোম শহরের বাইরে বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করতেন। তাই মনে করা হয় যে এই তিনটি গোষ্ঠী অর্থাৎ 'ট্রাই' থেকে 'ট্রাইবাস' শব্দের উৎপত্তি। কোন কোন নৃতাত্ত্বিক মনে করেন যে 'ট্রাইব' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Phule' অথবা 'Trifu' শব্দ থেকে (Mitra, 2008, p.17)।

ভারতীয় সংবিধানে Article-366(25) - এ আদিবাসীদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে "Scheduled Tribe means such tribes or tribal communities as parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article-342, to be Scheduled Tribes for the purpose of this Constitution" (Das Basu, Ray, Nandi, & Sen Gupta, 2007, p.961)।

ড: রিভার্স (Dr. Rivers) বলেছেন- "তারা সমাজের এমন একটি গোষ্ঠী যাদের জীবনের জটিলতা নেই যারা এখনো একই ভাষায় কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে, যাদের আকৃতি বা সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে, নিজেদের নিয়ম-কানুন রক্ষার জন্য যাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হলে যারা গোষ্ঠী সচেতন মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংগ্রাম করে থাকে তারাই আদিবাসী"।

সুতরাং উপরের সংজ্ঞা গুলিকে বিশ্লেষণ করলে আদিবাসীদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যাবে যেমন-

১) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর একটি নিজস্ব ভাষা রয়েছে, এবং এই ভাষার দ্বারা নির্দিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠীকে বোঝায়।

২) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি বলে তারা স্বীকার করে।

৩) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব সামাজিক প্রথা এবং রীতিনীতি।

৪) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস কিছুটা পৃথক হলেও বহু আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসে বহু ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একই।

৫) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে এবং অন্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতি থেকে বহু অংশে পৃথক।

৬) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ রয়েছে যেগুলি তারা নিজস্ব সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান সময়ে ব্যবহার করে থাকে।

৭) অধিকাংশ আদিবাসী গোষ্ঠী অত্যন্ত প্রাচীন অর্থনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এখনো জীবিকা নির্বাহ করেন।

৮) অধিকাংশ আদিবাসী গোষ্ঠী পাহাড়, জঙ্গল, ঝর্ণা এবং জঙ্গলের ঘেঁসে থাকা নদীর ধারে বাস করতে পছন্দ করে।

৯) ওঝা, গুনিন ও ডাইনি ইত্যাদি প্রথা সম্পর্কিত বিশ্বাস এদের মধ্যে প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায়।

বিখ্যাত নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এর মতে, দলিত ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর মানুষরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে এক ভয়ানক অবস্থার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ভারতে আদিবাসী, দলিত ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীরা সাধারণ মানুষদের তুলনায় আরো খারাপ অবস্থায় রয়েছে।

১.২ আদিবাসীদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Tribes):

প্রতিটি আদিবাসী শ্রেণীর নিজস্ব সংস্কৃতি, প্রথা, সামাজিক গঠন, ধর্ম, এবং ভাষা রয়েছে। তাই কোন দুইটি আদিবাসী শ্রেণি হুবহু এক নয়। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাই আদিবাসীদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এই প্রেক্ষাপট গুলি হল- ভৌগোলিক বিন্যাস, ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতির প্রকারভেদ, অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং সমন্বয়নের স্তর ইত্যাদি।

বিশিষ্ট সামাজিক নৃতাত্ত্বিক বিদ্যার্থী এবং রায় (১৯৮৫) ভৌগোলিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে আদিবাসী সমাজকে পাঁচটি প্রধান দলে ভাগ করেছেন এইগুলি হলো -

ক) দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চল

খ) পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চল

গ) মধ্য ভারত অঞ্চল

ঘ) হিমালয় এবং হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চল

ঙ) দ্বীপ অঞ্চল

১.৩ আদিবাসীদের জন্য সাংবিধানিক অধিকার (Constitutional Rights for Indigenous People or Tribes)

স্বাধীন ভারতে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আদিবাসী গোষ্ঠী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এরা এখনো দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন। তাই আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের উন্নয়নের জন্য ভারতের সংবিধানে বিভিন্ন ধারায় অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে ১৫ নং, ১৬(৪), ৩২০(৪), ৩৩৫, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ১৯ (৫), ৩৩৮, ৩৩৯ (২), ২৭৫ (১), ১৬৪, ৪৬, ২২৪, ৩৪২ প্রভৃতি ধারায় আইনানুগ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

১.৪ বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটির সুপারিশ (Recommendation of Different Commission and Committee)

ক) হান্টার কমিশন (Hunter Commission, 1882):

খ) রাধাকৃষনান কমিশন (Radhakrisnan Commission, 1948):

গ) মুদালিয়ার কমিশন (Mudaliur Commission, 1952-53):

ঘ) কোঠারি কমিশন (Kothari Commission, 1964-66):

ঙ) ন্যাশনাল পলিসি অফ এডুকেশন (National Policy of Education, 1986):

ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (NEP-2020):

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গঠিত হয়েছে ২০২০ সালে ভারতের জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে, মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, বৈষম্যহীন সমাজের অগ্রগতির জন্য, উচ্চ গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য, শিক্ষাদান ও শিক্ষা পদ্ধতির গুণগত দিক বৃদ্ধি এবং সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে। ভারতের পূর্বতন জাতীয় শিক্ষা নীতিগুলি বিশেষভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও শিক্ষাগতভাবে প্রাচীনকাল থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া SEDG (Socially and Economically Disadvantaged Groups) এবং তপশিলি আদিবাসীদের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে (২০২০) আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলি হল –

১) বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন।

২) আদিবাসীরা প্রথাগত শিক্ষা ও স্কুল শিক্ষাকে আজও বিদেশি হিসেবে মনে করে, এবং তাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে তাই এদের উন্নয়নের জন্য একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

৩) সরকারী তরফ থেকে সাংবিধানিক যে সুবিধা বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা আদিবাসীদের কাছে যাতে পৌঁছায় তার সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪) স্কুল শিক্ষায় যে সামাজিক বৈষম্য রয়েছে তার দূরীকরণ করতে হবে এবং সামাজিকভাবে শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী শিশুদের সমান শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

৫) আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অর্থাৎ আদিবাসী শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ও ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিশেষভাবে মহিলাদের ছাত্রী আবাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে ছাত্রী আবাসে থাকাকালীন মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬) অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে বা অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষাগতমান উন্নত করার জন্য অতিরিক্ত নবোদয় বিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এছাড়া অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

৭) এস.ই.ডি.জি (SEDG-Socially and Economically Disadvantaged Groups) এর অন্তর্গত বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে ও শিক্ষা বিকাশে বৈষম্য হ্রাস করতে হবে। যথার্থ মনোযোগ সহকারে এবং SEDG দের মধ্যে থেকে প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে বিশেষ ছাত্রাবাসে ব্রিজ কোর্স এর টাকা মুকুব ও বৃত্তিদানের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করতে হবে মাধ্যমিক স্তরে, যাতে তারা পরবর্তী স্তরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

১.৫ পুরুলিয়া জেলা হিসাবে সৃষ্টি হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background of Purulia District's Formation)

ভারতের পূর্বপ্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত ২৩ টি জেলার মধ্যে পুরুলিয়া একটি অন্যতম জেলা। পুরুলিয়া শহর পুরুলিয়া জেলার প্রধান প্রাণকেন্দ্র এবং এখানেই রয়েছে জেলার 'ডিস্ট্রিক্ট

ম্যাজিস্ট্রেটের' অফিস। পুরুলিয়া জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর গুলি হল ঝালদা, রঘুনাথপুর, আদ্রা, বলরামপুর প্রভৃতি।

জৈন ভগবতি সুত্র অনুসারে ১৬ টি মহাজনপদের মধ্যে বর্তমান পুরুলিয়া জেলা প্রাচীন বঙ্গের অধীনে ছিল (History, Tradition, Culture, Heritage, Tourism & Festival of Purulia, 2012)।

১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানি বাংলা, বিহার, ও ওড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলে বর্তমান পুরুলিয়া অঞ্চলটি ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আসে। তখন থেকে মানভূম জেলার নামে ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে এই অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ১৮০৫ সালে রেগুলেশন XVIX অনুসারে জঙ্গলমহল জেলার মধ্যে ২৩ টি পরগনা এবং মহলকে একত্রিত করে যে জেলা তৈরি হয় তার মধ্যে পুরুলিয়া অঞ্চলটি ছিল। ১৮৩৩ সালে রেগুলেশন XIII অনুসারে জঙ্গলমহল জেলাকে ভেঙে দিয়ে মানভূম জেলা তৈরি করা হয় যার প্রধান কেন্দ্র ছিল মানবাজার। মানভূম জেলাটি আয়তনে প্রকাণ্ড ছিল এবং এর মধ্যে ছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার কিছু অংশ এবং বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্যের ধানবাদ, ধলভুম, সরাইখোলা ইত্যাদি অঞ্চল। ১৮৩৮ সালে মানভূম জেলা পরিচালনা অফিসটি মানবাজার শহর থেকে বর্তমান পুরুলিয়া শহরে নিয়ে আসা হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৫৬ সালে মানভূম জেলাকে ভাগ করে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয় রাজ্য স্থাপন করা হয়। ১৯৫৬ সালের ১ লা নভেম্বর থেকে পুরুলিয়া জেলার জন্ম হয়।

১.৬ পুরুলিয়া জেলার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট (Geographical Background of Purulia District)

পুরুলিয়া জেলা হলো পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশের সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এবং জঙ্গলমহল জেলাগুলির মধ্যে একটি। পুরুলিয়া জেলার ২২.৬০ ডিগ্রী এবং ২৩.৫০ ডিগ্রী নর্থ ল্যাটিটিউ এবং ৮৫.৭৫ ডিগ্রি ও ৮৬.৬৫ ডিগ্রি ইস্ট লঙ্গিটিউড এর মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং পুরুলিয়া জেলা উত্তর থেকে পূর্ব ভাগে বিস্তৃত একটি জেলা। এটি মেদিনীপুর ডিভিশনের অন্তর্গত। পুরুলিয়া জেলার ভৌগোলিক সীমানা

৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার (2417 Sq KM)। পুরুলিয়া জেলার পূর্বদিকে রয়েছে বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, উত্তরে রয়েছে বর্ধমান জেলা এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যের ধানবাদ জেলা। পশ্চিমে রয়েছে ঝাড়খন্ড রাজ্যের বোকারো ও রাঁচি জেলা এবং দক্ষিণ ভাগে রয়েছে ঝাড়খন্ড রাজ্যের পশ্চিম সিংভূম এবং পূর্ব সিংভূম জেলা। সুতরাং পুরুলিয়া জেলার পূর্বদিকে এবং উত্তর দিকে কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সাথে সীমানা ভাগ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম ভাগে শেষ জেলা পুরুলিয়া এবং এর অবস্থান ট্রপিক্যাল। এটি অনেকটাই যেন ফানেল আকৃতির। বঙ্গোপসাগর থেকে মৌসুমী বায়ুকে পুরুলিয়া জেলার উপর দিয়ে বয়ে যেতে হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য রাজ্যে। অন্যদিকে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের মধ্যে প্রবেশদ্বার হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

১.৭ পুরুলিয়া জেলার উৎসব সমূহ (Festivals of Purulia District):

যেহেতু পুরুলিয়া জেলা প্রকৃতির কোলে অবস্থিত এবং তার চারিদিকে রয়েছে পাহাড় ও সবুজ অরণ্য তাই জঙ্গল এবং জঙ্গলে পশু পাখিদের সঙ্গে পুরুলিয়াবাসির রয়েছে এক আন্তরিক সম্পর্ক। তাই প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জেলা ব্যাপী সাংস্কৃতিক নিত্য নতুন উৎসব শুরু হয়। প্রতিটি ঋতুতে এবং প্রত্যেক ঋতুভিত্তিক উৎসবে এখানে চলে নাচ, গান এবং আনন্দের উৎসব। পুরুলিয়া জেলাতে বিভিন্ন ধরনের উৎসব রয়েছে যেমন –

১) শিবের গাজন, ২) দিসম সেন্দ্রাঃ, ৩) ধর্ম ঠাকুরের পূজাও মেলা, ৪) রোহিণী উৎসব, ৫) ইরোকসিম বা বাতুয়ালি, ৬) মনসা পূজা ৭) কারাম পরব, ৮) ছাতা পরব, ৯) ভাদু, ১০) জিতা অষ্টম, ১১) বাঁদনা পরব, ১২) জাথেল উৎসব, ১৩) রাস মেলা, ১৪) টুস, ১৫) বানসিং পূজা ও পরব, ১৬) আখ্যান যাত্রা বা পূজা, ১৭) চন্ডী পূজা বা খেলাই চণ্ডী, ১৮) মাঘসিম, ১৯) বাহা পরব বা উৎসব, ২০) ভেজা বেন্দা ইত্যাদি।

১.৮ পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা এবং সাক্ষরতার হার (Education & Literacy Rates of Purulia District):

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলায় সাক্ষরতার হার ছিল ৬৪.৪৮%, যেখানে পুরুষদের সাক্ষরতার হার ছিল ৬৬.৯৪% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৩.৪৬%। বিশেষ ভাবে তপসিলি জাতি এবং আদিবাসিদের সাক্ষরতার হার ছিল ১৯.৩৭% এবং ১৮.৪৫%। এই জেলায় নিরক্ষর শ্রেণীর মানুষদের সংখ্যা ছিল ১৩০৫২১০ জন । যেখানে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৪৯৪৯৩৮ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৮১০২৭২ জন। পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী-

১) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র

ক. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ২৫১২

খ. আই. সি. ডি. এস. এর অধীনে প্রাক বিদ্যালয় -২৩৯২

গ. প্রাইভেট ম্যানেজড ও প্রি-স্কুল- ১৭

ঘ. শিশু শিক্ষা কেন্দ্র-১৯২

২) প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

ক. অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়- ২৯৯৮

খ. পিএস কার্যকারিতা ২৯৭১

গ. শিক্ষক সংখ্যা-৬০৪২ (পুরুষ-৪৮২২ ও মহিলা- ১২২০)

ঘ. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা-৩৬১৬(পুরুষ-৩১৪০ ও মহিলা ৪৭৬)

ঙ. শিক্ষার্থী ভর্তি- ২৫৮৫৯৬(বালক- ৪৪০০৬০ ও বালিকা- ১১১৫৩৬)

চ. বিদ্যালয় ভবনের সংখ্যা- ৮০

ছ. ছাদ বিল্ডিং স্কুল-৩৩৬

এছাড়া এই পুরুলিয়া জেলায় মোট ১১ টি ডিগ্রী কলেজ, একটি বি.এড কলেজ, একটি শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়।

১.৯ পুরুলিয়া জেলার ভাষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস (Language & Religion of Purulia District):

পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলায় ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলা ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ৮০.৫৬%, ও সাঁওতালি ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ১১.১৭%, কুরমালি ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ৫.০৪% এবং হিন্দি ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ১.৯৩%।

পুরুলিয়া জেলা একটি আদিবাসী সংস্কৃতি জেলা। এই জেলায় আদিবাসীরা প্রাকৃতিক সাস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই জেলাতে হিন্দু ধর্মের মোট জনসংখ্যা হল ৮০.৯৯%, ও তপশীলি জনগোষ্ঠী বা আদিবাসীদের জনসংখ্যা ১০.৫৫%, ইসলামের ধর্মাবলম্বি মোট জনসংখ্যা ৭.৭৬% এবং অন্যান্য ধর্মের মোট জনসংখ্যা ০.৭০%।

১.১০ পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় (Adibasi or Tribal Community of Purulia District)

পুরুলিয়া জেলাটি হল আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা। এখানে ২০১১ সালের জনগণনা আনুসারে মোট জনসংখ্যা হল ২৯৩০১১৫ জন, একটি বড় অংশ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ এখানে রয়েছেন। পুরুলিয়া জেলার সাথে ঝাড়খণ্ডের মানভূম জেলার সীমানা রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলটি একদিকে যেমন খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ তেমনি ওই অঞ্চলটিতে যথেষ্ট সংখ্যক বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। নৃতাত্ত্বিকদের মতে ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে খাদ্য এবং বাসস্থানের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় উপস্থিত হন এবং এখানেই তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তবে কিছু কিছু নৃতাত্ত্বিক,

ঐতিহাসিক এবং আদিবাসীদের মতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া হল ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ, তাই পূর্ব-পুরুষ থেকে বংশ পরম্পরায় এই অঞ্চল গুলিতেই গভীর জঙ্গলে এবং পাহাড়ের উপর আদিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই বসতি স্থাপন করছেন। পুরুলিয়া জেলায় আয়ো:দা বুরু অর্থাৎ অযোধ্যা পাহাড় এবং তার সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমিতে বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ গভীর জঙ্গল রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলটি আদিবাসীদের বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত। পুরুলিয়া জেলায় ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় রয়েছে, যেমন- সাঁওতাল, মুণ্ডা, মুড়া, মাহালি, হো, ভূমিজ, বিরহড়, খারিয়া, ওঁরাও, কোড়া, বেদীয়া, মাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্য সম্পর্কিত পর্যালোচনা

(Review and Related Literature)

২.১ পর্যালোচনা এবং সাহিত্য (Review and Literature):

জয়িতা সিনহা এবং ডঃ সুরেশ চন্দ্র মুর্মু (২০২০) বিরহড় আদিবাসীদের ধর্মীয় সম্পর্কিত নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটি গবেষণাধর্মী পত্র প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম হল **"Religious Transformation of the Birhor Tribe: An Anthropological Analysis".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য ছিল বিরহড় আদিবাসীদের ধর্মীয় রূপান্তর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং আদিবাসীদের জীবনে ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রভাব।

সাগর চৌধুরি, হাবিবুর রহমান চৌধুরি এবং হরিশ সিং (২০১৬) ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষের নৃতাত্ত্বিক ব্যবহার সম্পর্কে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণার শিরোনাম হল **"Some Ethno Zoological uses of Birhor Tribe of West Bengal, India".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা ২৯ টি গৃহ পালিত এবং বন্য প্রাণীর উপর তাঁদের নিজস্ব যে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞান রয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা।

জিতেন্দ্র কুমার প্রেমি এবং অরুন কুমার (২০১৮) ছত্রিশগড় রাজ্যের বিপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী বিরহড় আদিবাসীদের উন্নয়ন এবং সামাজিক অসমতা সম্পর্কিত একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। তাঁদের গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল **"Development and Social Inequality Among Birhor: A Particularly Vulnerable Tribal Groups of Chhattisgarh, India".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল ছত্রিশগড় রাজ্যের বিরহড় আদিবাসীর বিভিন্ন উন্নয়নের দিক অধ্যয়ন করা। এই রাজ্যের বিরহড় আদিবাসীদের সামাজিক বৈষম্যের প্রাদুর্ভাব চিহ্নিতকরণ। তৎকালীন উপলব্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের সম্ভবনাগুলি কল্পনা করা।

নির্মল চন্দ্র মুদী (২০১৮) সীমান্তবর্তী বাংলায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি গবেষণা করেন। এই গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল-**"Transformation of Socio-Cultural Condition of Tribal Community in Frontier Bengal Identity Crisis and Present Scenario".**

উদ্দেশ্য: বাংলায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার রূপান্তর অধ্যয়ন করা।

শুভাশিস ভট্টাচার্য ও গিয়াসউদ্দিন সিদ্দিকী (২০১৬). পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল অঞ্চলের আদিবাসী আবাস বনভূমির গুরুত্ব সম্পর্কে একটি গবেষণা সম্পর্কিত পত্র প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম হল-**"Significance of forested in the tribal Habitation of Jungle Mahal area in West Bengal".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণায় গবেষক আদিবাসী এলাকায় বন কোর চিহ্নিত করতে, উপজাতি ঘনত্ব অঞ্চল পরিমাপ করতে এবং বন ও উপজাতিদের বসতি উভয় ধীরে ধীরে পাতলা হওয়ার মাত্রা পরিমাপ করতে এই গবেষণাটি করা হয়েছিল।

সমিতা মান্না এবং রিমি সরকার, (২০১৫) একবিংশ শতাব্দীতে বিরহড়দের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায় কয়েকটি গ্রামে একটি মাইক্রো স্টাডি করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম টি হল- **"The Birhor Ways of Life in 21st Century: A Micro Study in a Few Villeges of Hazaribag District, Jharkhand".**

উদ্দেশ্য: ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায় একবিংশ শতাব্দীতে বিরহড়দের জীবনযাত্রা অধ্যয়ন ও কয়েকটি গ্রামে একটি মাইক্রো স্টাডি।

প্রসেনজিৎ দেববর্মণ (২০১৫) পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি সার্বিক বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল- **"Birhor of West Bengal: an Overview on A Tribe in Transition".**

উদ্দেশ্য: গবেষক তাঁর গবেষণা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, জেলায় বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর জনসংখ্যা এবং বিরহড়দের সম্পর্কে পণ্ডিতদের লেখা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যয়ন করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

সোমনাথ মুখার্জি (২০১৪) পুরুলিয়া জেলায় সাঁওতাল, খেড়ীয়া শবর ও বিরহড় মহিলাদের শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল-**"Status of Female Education among Santal, Kheria Sabar and Birhor Tribal Communities of Purulia District, West Bengal, India".**

উদ্দেশ্য: গবেষক তাঁর গবেষণায় বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার দশটি অ-জাতিগত এবং দশটি বহুজাতিক গ্রামে বসবাসকারী তিনটি প্রধান উপজাতি সম্প্রদায় যথা সাঁওতাল, খেরিয়া-শবর এবং বিরহড় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী শিক্ষার স্তর বিশ্লেষণ করা।

মারি লোলেন (২০১২). অরুণাচল প্রদেশের মাউন্টেন হ্যাবিট্যাটে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থা ও মেম্বাদের জীবিকা নির্বাহের ধরণ সম্পর্কিত একটি গবেষণা করেছিলেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল- **"Utilization and Conservation of Natural Resources in Mountain Habitat: A Study on Livelihood Pattern and Indigenous Knowledge System of The Memba of Arunachal Pradesh".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মেম্বা কীভাবে তাদের দেশীয় আদিবাসীও জ্ঞান ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার করে তা বোঝা এবং নথিভুক্ত করা। এছাড়া এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মেম্বারা তাঁদের বিভিন্ন বিশ্বাস, সামাজিক-ধর্মীয় রীতিনীতি, ট্যাবু,

ঐতিহ্যবাহী পরিবেশগত জ্ঞান ব্যবস্থা যা সম্পদ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রথাগত আইনকে যুগযুগ ধরে টিকিয়ে রাখা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী গ্রাম কাউন্সিলের ভূমিকা খুঁজে বের করা।

এস কে কোলে (১৯৯৭) বিরহড়দের সম্ভাবনা এবং সমস্যা নিয়ে একটি মূল্যায়ন সম্পর্কিত গবেষণা ধর্মী পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রটির শিরোনাম হল-**"Prospects and Problems of Birhor: an Evaluation".**

উদ্দেশ্য: গবেষক তাঁর গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিরহড় উপজাতি গোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মাইক্রো লেভেল মূল্যায়নমূলক অধ্যয়নের চেষ্টা এবং বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা অন্বেষণ করা।

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯২) পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি গবেষণা চালান। তাঁর গবেষণার শিরোনাম হল **"Poorest of the Poor "Birhor"- a Primitive Tribe of West Bengal".**

উদ্দেশ্য: এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার আধা-যাযাবর উপজাতি বিরহড়দের আর্থ-সামাজিক জীবনের বিশেষ উল্লেখ সহ আদিমতার মাত্রা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

ভবেশ চক্রবর্তী (১৯৮০) পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসীদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- **"The Birhors of West Bengal and the Rehabilitation Scheme: A Case Study".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণা পত্রটির উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সালে বাঘমুন্ডি ও ঝালদা থানার অন্তর্গত দুটি স্থানে পরিকল্পিতভাবে নির্বাচিত পুনর্বাসন ও বিরহড়দের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং এই পত্রটির উদ্দেশ্য হল কার্যকর হওয়া প্রকল্পগুলির প্রভাব মূল্যায়ন করা।

এম. গ্যাডগীল (১৯৯৮) তৃণমূল স্তরে পরিবেশ সংরক্ষণ চর্চা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণার শিরোনাম হল-**"Grassroots Conservation Practices: Revitalizing the Tradition". তাঁর** গবেষণার ভিত্তি ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণে সুসামাজিক ক্ষেত্রটিকে আবিষ্কার করা যাতে করে আদিবাসীদের চিরাচরিত জ্ঞান ভাণ্ডারে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। গুণগত মান ভিত্তিক এই গবেষণায় গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে আঞ্চলিক মানুষদের হাতে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের দায়িত্ব তুলে দিতে হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে হবে। গবেষক কোন নির্দিষ্ট আদিবাসী এলাকা বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেননি।

এস. কে. চৌধুরী (২০০৮) অরুণাচল প্রদেশের আদিবাসীদের মধ্যে চিরাচরিত লোকবিশ্বাস এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল-**"Folk Belief and Resource Conservation: Reflection from Arunachal Pradesh".** সমগ্র পৃথিবীতেই ধীরে ধীরে একটি ধারণা মূর্ত হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ বিশেষত আদিবাসী মানুষজন যারা প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিদ্ধ্যে বাস করেন তাঁদের কাছ থেকে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের গুরুত্ব রয়েছে। তাঁদের মতে লোকায়ত বিশ্বাস ধর্ম নিরপেক্ষ এবং পবিত্র বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণী বিষয়ে আমাদের যে লোকায়ত বিশ্বাসতা আমাদের সংরক্ষণে সহায়তা করে।

ফারুক, ডোলোক এবং কাল্লা (২০০৭) উত্তর পূর্ব ভারতের আপাতানি জনগোষ্ঠীর দ্বারা প্রকৃতির সম্পদের পরিচালনা সমন্ধে চিরাচরিত জ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করেন। প্রকাশিত এই গবেষণার শিরোনাম হল-**"Traditional Wisdom of Apatani Community in the Management and Sharing of Natural Resources in North East India. Ink K. Misra (Ed). Traditional Knowledge in Contempory Societies: Challenges and Opportunities".** গবেষণায় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে আপাতানি জনগোষ্ঠী ধারাবাহিক ভাবে তাঁদের সেচ এবং সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে যেমন (জল, মাটি, মানব সম্পদ) চিরাচরিত ভাবে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার বিষয়ে বিশ্বাসী। সারা বছর ধরে যে জল পাওয়া যায় তাকে সেচ কার্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা চিরাচরিত কিছু নীতি মেনে চলেন যা প্রকৃত পক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণকে সুচিত করে।

এম. লোলেন এবং বি. এ. লশকর (২০১১) মাটির উর্বরতা রক্ষায় মেম্বা আদিবাসীদের ভুমিকা সমন্ধে গবেষণা করেছেন। প্রকাশিত গবেষণার শিরোনামটি হল-**"Soil Fertility Management by Memba Tribes of Mechukha Valley, Arunachal Pradesh".** তাঁদের মধ্যে মাটির উর্বরতা রক্ষায় এবং প্রাকৃতিক বাবস্থাপনায় চাষবাসকে সুরক্ষিত **রাখার** জন্য গাছের পাতা এবং গোবরকে সার হিসাবে ব্যবহারের প্রচলন দীর্ঘ কাল ধরে চলেছে। তাঁদের গবেষণায় প্রমাণিত যে মেম্বা আদিবাসীর চিরাচরিত লোকজ্ঞান তাঁদের কৃষি এবং পরিবেশের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এরা স্বাস্থ্যকর খাবার সংগ্রহ করতে সচেষ্ট।

এস. পি. সিং (২০০৫) অরুণাচল প্রদেশের ওষধি গাছ এবং সুগন্ধি গাছ সংগ্রহ এবং ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল-**"Collection and Utilization of Medicinal and Aromatic Plants in Arunachol Pradesh",** বিভিন্ন ওষধি গাছের কোন কোন অংশকে এবং কি ভাবে ব্যবহার মানুষের কোন কোন রোগের চিকিৎসায় করা হয় এবং কি ভাবে তাঁরা সুস্থ্ হন সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন। এর জন্য তিনি অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে আদিবাসীদের চিকিৎসা বিজ্ঞান সমন্ধে চিরাচরিত লোকজ্ঞান কি ভাবে পরিবেশের সুরক্ষার সাথে সাথে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারাকে সুরক্ষিত রাখে।

২.২ জ্ঞানের ব্যবধান (Knowledge Gap):

আদিবাসীদের শিক্ষা এবং উন্নয়নে সমাজবিজ্ঞানী, নৃ-বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে চলেছেন। ১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮৮ সালে M. B. Buch-এর তত্ত্বাবধানে আদিবাসী বিষয়ে ভারতে সংগঠিত বিভিন্ন গবেষণার সংকলন 'Survey of Research in Education' -এর তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। NCERT (NEW Delhi)-এর তত্ত্বাবধানে চতুর্থ খন্ডে আদিবাসীদের বিষয়ে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে গবেষণা হয়েছে---

১) আদিবাসী এলাকায় বিদ্যালয় গঠন এবং বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ।

২) আশ্রমিক বিদ্যালয়, বনবাসী আশ্রম বিদ্যালয় ইত্যাদি আদিবাসীদের দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান এবং পরিবেশ।

৩) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, বোধ মূলক সামর্থ্য, পরিবেশ এবং সহ পাঠক্রমের সঙ্গে মানিয়ে চলবার ক্ষমতা, সমাজ তাত্ত্বিক, বিজ্ঞান বিষয়ে মনোভাব ইত্যাদি।

৪) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের অসময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাওয়া ও ফেল করে বছরের পর বছর থেকে যাওয়া এবং সম্পদের অপচয়।

৫) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক প্রয়োজন সমূহ।

৬) আদিবাসী পরিবার গুলির গঠন, আদিবাসী মা-বাবাদের আচরণ। শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সংরক্ষণ।

৭) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা এবং আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা এবং সমাজ পরিবর্তন এবং আধুনিকীকরণ বিষয়ে গবেষণা।

'Fifth Survey of Educational Research' (১৯৮৮-১৯৯২)-এ ধরা পড়েছে যে তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত এবং তথ্য নির্ভর উপাত্ত পাওয়া যায়নি। তপশিলি উপজাতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উন্নয়নে যে অসংখ্য সামাজিক, মানসিক বাধা রয়েছে সেই বিষয়েও গবেষণায় যথেষ্ট আলোকপাত হয়নি। তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের কারণে সামাজিক স্তরবিন্যাসে পিছিয়ে পড়ার যে প্রবণতা সে বিশেষও কোনো আলোকপাত করেনি। সমাজের বিভিন্ন অন্যায়, নৈরাজ্য এবং আইন বহির্ভূত আচরণের সম্মুখীন হতে হয় আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিষয়েও গবেষকরা চুপ করে থেকে গেছেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ সময়কালে যে ১৪ টি Ph.D. স্তরে গবেষণা হয়েছে তার কোনটিতে আদিবাসী সমাজ কিভাবে চিরাচরিত ধ্যান ধারণাকে বজায় রেখে আজও নিজেদেরকে টিকিয়ে নিয়ে চলেছে এই বিষয়ে কোন আলোকপাত ছিল না। এই সময়কালে যে গবেষণাগুলি সংঘটিত হয়েছে তাদের মূল ক্ষেত্র ছিল –

১) বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা এবং সমস্যার সমূহ।

২) আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা, শিক্ষার সুযোগ সুবিধা, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা এবং আদিবাসীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক আগ্রহ।

৩) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ।

৪) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন বিষয়ে গবেষণা।

১৯৮৮ থেকে ৯২ এই পর্যায়েও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ভাষাগত সমস্যা নিয়ে কোন গবেষণায় চোখে পড়েনি। এছাড়াও আদিবাসীরা কিভাবে বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ-গাছড়া ব্যবহার করে নিজেদের সুস্থ্ এবং সবল রেখেছেন সেই বিষয়েও কোন গবেষণা বর্তমান গবেষকের চোখে পড়েনি।

'Sixth Survey of Educational Research' (1993-2000) এই সময় কালে আদিবাসীদের শিক্ষা বিষয়ে একটি D.Litt- স্তরে গবেষণা হয়েছে এবং সাতটি Ph.D. স্তরে গবেষণা হয়েছে এছাড়া এই সময়কালে NCERT (NEW Delhi) এই বিষয়ে দুইটি গবেষণা করেছেন, NIEPA (New Delhi) একটি গবেষণা করেছেন, ERIC সাহায্য পুষ্ট দুইটি গবেষণা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে আদিবাসীদের শিশু লালন-পালন বিধি শিক্ষা ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী এবং বিদ্যালয় গত শর্ত সমূহ, আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবৈজ্ঞানিক শর্ত সমূহ, আদিবাসী শিক্ষকদের শিক্ষকতা চলাকালীন প্রশিক্ষণ, 'Tribal Area Sub-Plan'-এর আদিবাসীদের শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, আদিবাসী বিদ্যালয়গুলির জেলার সামগ্রিক বিকাশে ভূমিকা, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক উন্নয়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, আদিম আদিবাসী গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, আদিবাসী যুবক যুবতীদের শিক্ষামূলক কৃতিত্ব অর্জনের মনোসামাজিক শর্ত সমূহ, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের অকালে পাঠ শেষ না করে বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের যৌনতা এবং নৈতিকতা বিষয়ে বিচার বিবেচনা, বিভিন্ন আদিবাসী এলাকায় বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ, আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা,

আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাষাগত সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা হয়েছে সুতরাং এই সময় কালে স্বল্প পরিসরে হলেও আদিবাসী সমাজের শিক্ষা গত উন্নয়নে ভাষাগত সমস্যা বিষয়ে একটি গবেষণা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছর সমূহের গবেষণাগুলিতে সংগঠিত হয়নি।

আদিবাসীদের শিক্ষাগত উন্নয়নে বিভিন্ন মিশনারি স্কুল এবং সমাজ সেবামূলক ভূমিকা বিষয়ে এই পর্যায়ে গবেষণা সংঘটিত হয়নি। আদিবাসী এলাকায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সমস্যা এবং আদিবাসী সমাজের উপর বয়স্ক শিক্ষার প্রভাব বিষয়ে গবেষণা হয়নি। আদিবাসীদের শিক্ষা তাদের সমাজ ব্যবস্থায় কোনরূপ প্রভাব ফেলেছে কিনা এই বিষয়ে গবেষণা সংঘটিত হয়নি। পাঠ্যক্রমে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে কিনা এই বিষয়েও কোন গবেষণা হয়নি।

২০০০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে যে সকল গবেষণা হয়েছে তাতে খুব কম ক্ষেত্রে ‘Indigenous Knowledge System’ কিভাবে আদিবাসীদের Sustainable Development এ ভূমিকা নিয়েছে এই বিষয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে।

২.৩ গবেষণার প্রশ্ন (Research Questions):

১) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার কত?

২) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষাগত অবস্থা কি?

৩) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের অবস্থা কি?

৪) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবস্থা কি?

৫) বিরহড়রা আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বনজ সম্পদ ব্যবহার করে এবং জীবিকা নির্বাহে তাঁদের অর্থনৈতিক স্থিতি কিরূপ?

৬) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণের জন্য তাঁদের বিভিন্ন বিশ্বাস, সামাজিক ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় রীতিনীতি, ট্যাবু এবং দেশীয় পরিবেশগত জ্ঞান ব্যবস্থা কি কি?

৭) পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষাগত উন্নয়ন সম্পর্কিত সরকারী ও বেসরকারি উভয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী সমূহ কি কি?

৮) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে আদিবাসী দেশীয় জ্ঞান ব্যবস্থা প্রয়োগের পরামর্শ কিরূপ?

২.৪ উদ্দেশ্য সমূহ (Objectives):

১) পুরুলিয়া জেলায় বিরহড়দের সাক্ষরতা হার অধ্যয়ন করা।

২) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাগত অবস্থা অধ্যয়ন করা।

৩) পুরুলিয়া জেলায় বিরহড় আদিবাসীদের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সামাজিক, সংস্কৃতিক কার্যক্রম অধ্যয়ন করা।

৪) পুরুলিয়া জেলায় বিরহড় আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে অধ্যয়ন করা।

৫) বিরহড়দের আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বনজ সম্পদের ব্যবহার এবং জীবিকা নির্বাহে অর্থনৈতিক জীবনের ধরণ অধ্যয়ন করা।

৬) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বিরহড়দের বিভিন্ন বিশ্বাস, সামাজিক-ধর্মীয় রীতিনীতি, ট্যাবু, আদিবাসী পরিবেশগত জ্ঞান ব্যবস্থা অধ্যয়ন করা।

৭) পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষাগত উন্নয়ন সম্পর্কিত সরকারী ও বেসরকারি উভয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী গুলি অধ্যয়ন করা।

৮) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে পরিবেশবান্ধব গবেষণার দ্বারা আদিবাসী দেশীয় জ্ঞান পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য পরামর্শ প্রদান করা।

২.৫ অধ্যয়নের সীমাবদ্ধতা (Delimitations of the Study):

১) বর্তমানে গবেষণাটি কেবলমাত্র বিরহড় সম্প্রদায়ের উপর করা হয়েছে।

২) কেবলমাত্র পুরুলিয়া জেলায় বাসকারী বিরহড় জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

৩) কেবলমাত্র গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪) এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি ব্লক নির্বাচন করা হয়েছে।

৫) এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি ব্লকের অধীনে চারটি গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি

(Research Methodology)

৩.১ গুণগত এবং নৃতাত্ত্বিকগত গবেষণার নকশা (Qualitative and Ethnographic Research Design)

গুনগত গবেষণার (Qualitative Research) সুস্পষ্ট এবং যথার্থরূপ বিংশ শতকে সমাজ বিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ প্রমুখদের গবেষণায় প্রথম প্রামাণ্যরূপ লাভ করেছে। যদিও গুনগত গবেষণার যথার্থতা প্রমানিত, কিন্তু এর পদ্ধতিগত স্পষ্টতা নিয়ে এখনও গবেষকরা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। গুনগত গবেষণা এমন একটি পদ্ধতি যা কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ঘটনাকে পুরোপুরি ভাবে এবং ব্যাখ্যামূলক ভাবে দেখার চেষ্টা করে। সাধারণত কোনো সামাজিক বা মানবিক গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির সামগ্রিক চেহারাটিকে উন্মোচিত করার জন্য গুণগত গবেষণা ব্যবহৃত হয়। গুণগত গবেষণা সংগঠিত হয় পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে প্রশ্নকরা, প্রশ্ন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা, আরোহি পদ্ধতিতে উপাত্তগুলিকে বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট থেকে সাধারণীকরনের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সংগৃহীত উপাত্ত সমূহের ব্যাখ্যা করা হয়।

গবেষক তার বর্তমান গবেষণাটি বিরহড় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং পরিবেশে স্থিতিশীল উন্নয়নে ভারতে আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের ব্যবস্থার অবদান বিষয়ে ‘Ethnography’ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ ৩ বছর ছয় মাস পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষক বিরহড়দের সাথে গভীরভাবে মেলামেশার মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন- অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন, ফোকাস দল

আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার, ডাইরি লিখন, ছবি সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যবহার করে গভীরভাবে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

৩.২ পর্যবেক্ষণ (Observation):

সমাজ বিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে সাধারণভাবে গবেষকরা প্রশ্নগুচ্ছ বা Questionnaire ব্যবহার করে উত্তরদাতার নিকট থেকে তাঁদের ভাবনা চিন্তা এবং কর্মধারার একটি চিত্র লাভ করার চেষ্টা করেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে ইতিবাচক পরিবেশে কথোপকথন চলে এবং এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহীতা সাক্ষাৎকার দাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। সাক্ষাৎকার কালে উভয় পক্ষই পরস্পরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। পরস্পরের ভাব, মানসিকতা, মানবভাব, সংস্কৃতি, ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস ইত্যাদি জানার চেষ্টা করেন। তাই পর্যবেক্ষণ কে নমুনা দলের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রথম পদ্ধতি বলে স্বীকার করা হয়।

বর্তমান গবেষণায় গবেষক চারটি বিরহড় আদিবাসী গ্রামে সুসংগঠিত ও অসংগঠিত উভয়প্রকারের তথ্য গ্রহণ কালে তথ্য দাতাদের মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন ও বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

৩.৩ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (Participatory Rural Appraisal):

সমাজবিজ্ঞানে, নৃতত্ত্বে, শিক্ষাবিজ্ঞানে এবং সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণায় Participatory Rural Appraisal (PRA) বা অংশগ্রহণ ভিত্তিক গ্রামের সম্পদের মূল্যায়ন পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আধুনিক কালে পরিবেশ বিজ্ঞানের গবেষণায় অংশগ্রহণ ভিত্তিক গ্রামীণ সম্পদের মূল্যায়ন বা PRA এর ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

PRA পদ্ধতিতে একটি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন স্থানের মানুষের সম্পদের স্থান নির্ণয় করণ সম্পদের পরিমাপন এবং সম্পদের স্থানান্তরিত করনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ

মানুষের আয় বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক কৃষি কাজের মডেল তৈরি করেন। প্রাতিষ্ঠানিক নকশা গড়ে তোলেন এবং চিরাচরিত ধারা এবং পরিবর্তন কে বিশ্লেষণ করেন এবং মডেলে গৃহীত নকশা বিশ্লেষণ করেন। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালনার ক্ষেত্রে মৃত্তিকা এবং জল সংরক্ষণে বনজ সম্পদ, মৎস্য চাষ, বনজ প্রাণীর সম্পদের সংরক্ষণে গ্রামীণ মানুষের ভূমিকা এই পদ্ধতিতে স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়া PRA ব্যবহার করে কৃষিকাজ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রভৃতির মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করা হয়।

গবেষক প্রথমে বিরহড়দের গ্রামে পৌঁছে গ্রামের মোড়ল এবং ন্যায়কে কে সবিস্তারে জানান আসার কারণ। বিরহড় গ্রামের প্রায় সকলকেই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান জানান। গবেষক গবেষণার উদ্দেশ্য সকলকে বলেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। গবেষক তথ্য সংগ্রহের জন্য সাদা আর্ট পেপার, পেন্সিল ও রঙিন স্কেচপেন কম বয়সী বিরহড় যুবক যুবতীদের হাতে ধরিয়ে দেন। এরপর গবেষক আর্ট পেপারে গ্রামের সীমানা নির্ধারণ করতে বলেন এবং গ্রামের চতুর্থ দিকে কি কি আছে তা স্পষ্ট লিখতে ও অঙ্কন করতে বলেন। যেমন গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রধান পাকা পিচযুক্ত রাস্তা, কংক্রিট ঢালায় রাস্তা, কাচা মাটির রাস্তা আঁকতে বলেন। এরপর রাস্তার কোন দিকে কটি বাড়ি, পুকুর, কুঁয়ো, নলকূপ, চাষ যোগ্য জমি, ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার, গাছপালা, ইত্যাদি গুলিকে অঙ্কন ও চিহ্নিত করতে বলেন। গ্রামে মোট বিরহড়দের বাড়ির সংখ্যা, বিদ্যালয়, সম্প্রদায় হল, নদী, খাল, মন্দির, পাহাড়, জঙ্গল, অন্যান্য দোকানের স্থান ইত্যাদি গুলিকে বিভিন্ন বর্ণের স্কেচপেন ব্যবহার করতে অঙ্কনকারীকে উদ্বুদ্ধ করেন। এরপর গবেষক বিরহড়দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবারগুলির আর্থিক উপার্জনের উৎস, বিরহড় যুবক যুবতীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান থেকে অকালে ঝরে পড়ার প্রবণতা, উচ্চশিক্ষা লাভের সমস্যা দারিদ্র্য দূরীকরণে কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, জমির উৎপাদন চিত্র, পানীয় জলের সমস্যা, শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিপ্রাহরিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষিত পুরুষ নারীর সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষক বিষয় এবং সমস্যার

সমাধান বিষয়ে আলোচনাকালে কোন কোন বিরহড় গ্রামবাসী নমনীয়তার সাথে বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং কাদের ভাবনার মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে ও সৃজনশীলতা কাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে স্পষ্ট তা গবেষক জানার চেষ্টা করেন।

৩.৪ ফোকাস দল আলোচনা (Focus Group Discussion):

ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাসন (FGD) একটি গুণগত মান ভিত্তিক গবেষণাকে সূচিত করে। এটি একদিকে যেমন গবেষণা পদ্ধতি তেমনি অপরদিকে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের একটি টেকনিকও বটে। এই পদ্ধতিতে একই ধরনের প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা এবং একই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করা, কিছু মানুষকে একত্রিত করে গবেষক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং গভীরতর ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিছু তথ্য বা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। সাধারণত যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটিতে ফোকাস গ্রুপে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সদস্যের আগ্রহ থাকে। এই পদ্ধতিতে এমনভাবে গবেষক বা পেশাদার ব্যক্তি আলোচনায় যান এবং প্রশ্ন তোলেন যেখানে অংশগ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট সমস্যা বিষয়ে ধারণা, মনোভাব, বিশ্বাস, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, মতামত ইত্যাদি উঠে আসে। পারস্পরিক আলোচনা কালে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের মতামত এবং অভিজ্ঞতাকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নেন। এটি ধরে নেওয়া হয় যে PRA দলের আলোচনা কালে PRA দলে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, মতামত, মনোভাব, নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য সকলেই সচেষ্ট হন।

গবেষক বিরহড় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং পরিবেশে স্থিতিশীল উন্নয়নে আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের ভূমিকা মূল আলোচ্য বিষয় তাই গবেষক বিরহড়দের চারটি গ্রামে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং বিরহড়দেরকে প্রথমেই গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে গবেষক তাঁর পূর্বতন অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণকে ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের আলোচনা পর্বটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই পর্যায়ে গবেষক তথ্যদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ফোকাস দল আলোচনায় সক্রিয়

অংশগ্রহণে আহ্বান করেন। গবেষক বিরহড় পুরুষ এবং মহিলাদেরকে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলার জন্য নিবেদন করেন। এরপর দীর্ঘসময় ধরে আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে গবেষক যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

৩.৫ উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার (Open Interview):

গবেষক প্রথমেই চারটি গ্রামের বিরহড় ন্যায়কে বা মাঝি এর সাথে দেখা করেন এবং গবেষক কীসের জন্য এসেছেন তা বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে বিস্তারিত ভাবে জানান এবং বিরহড় ন্যায়কে বা মাঝির কাছে আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জন করেন। চারটি গ্রামের ৪ জন ন্যায়কে বা মাঝির কাছ থেকে দীর্ঘসময় ধরে উন্মুক্ত বা অসংগটিত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বিরহড় ন্যায়কে বা মাঝি তাদের সামাজিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, দায়দায়িত্ব, প্রথা, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে গবেষককে তথ্য দিয়েছেন। গবেষক উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

৩.৬ পুরুলিয়া জেলার তিনটি ব্লকের অধীনে চারটি গ্রামের পার্শ্বচিত্র (Profile of four Villages at under the Three Blocks in Purulia District)

পুরুলিয়া জেলায় ২০ টি ব্লকের মধ্যে মুলত তিনটি ব্লকে বেশিরভাগ বিরহড় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা বসবাস করে। এই ব্লকগুলি হল- বাঘমুণ্ডী, ঝালদা-১, এবং বলরামপুর ব্লক। এছাড়াও হুড়া ব্লকেও কিছু বিরহড় আদিবাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই তিনটি ব্লকের চারটি বিরহড় গ্রাম (ভুপতিপল্লী, বাড়েরিয়া, বেড়সা এবং ডাকাই) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১) ভুপতিপল্লী গ্রামের পার্শ্বচিত্র (Profile of Bhupotipolly Village):

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লকে ভূপতিপল্লী নামে একটি বিশেষ গ্রাম রয়েছে যে গ্রামটির অপর নাম মাটিয়ালা। এই মাটিয়ালা বা ভূপতিপল্লী গ্রামটি বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েতের অধীনে অন্তর্গত। এই গ্রামটির জেএল নাম্বার হল ৯৯। গ্রামটি থেকে বাঘমুণ্ডি ব্লক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব ৪.৫ কিলোমিটার।

ভূপতিপল্লী গ্রামটিতে প্রথম বিরহড় আদিবাসীদের বসবাস শুরু হয়েছিল, এই গ্রামটিতে কেবলমাত্র বিরহড়দের উন্নয়নের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। এই গ্রামটিতে প্রায় ৭০ টিরও বেশি বিরহড় পরিবারের বসবাস এবং সাথে সাথে বিরহড় বিকাশের জন্য তাঁদের গ্রামেই একটি 'সম্প্রদায় হল' বা কমিউনিটি হল রয়েছে। সম্পূর্ণ জেলায় এই ভূপতিপল্লী গ্রামে প্রথম বিরহড়দের পুনর্বাসন করা হয় পাহাড় থেকে তাদেরকে নামিয়ে এনে এবং তাদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রামে একটি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে, এই গ্রামে কোন উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রী কলেজ নেই। এই গ্রাম থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ের দূরত্ব ৫.২ কিলোমিটার তাই বিরহড় শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষা শেষ করার পর তাদেরকে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জনের জন্য ৫.২ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে বিদ্যালয়ে যেতে হয়। এর ফলে বিরহড় আদিবাসী ছেলে মেয়েরা খুব বেশি শিক্ষালাভের সুযোগ পায়না। প্রথমত নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে বিরহড় গোষ্ঠীভুক্ত কোন শিক্ষক/ শিক্ষিকা/ শিক্ষা কর্মী নেই। তাই বিরহড় আদিবাসী ছেলে মেয়েরা স্কুলে গিয়ে তাদের সংস্কৃতির কোন ছাপ দেখতে পায় না। ফলে এরা নিজেদেরকে ব্রাত্য বলে মনে করে। তাই একদিকে দূরত্ব এবং অন্য দিকে সংস্কৃতিগত দূরত্বের কারণে বিরহড় ছেলে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ নিতে পারে না।

২) বাড়েরিয়া গ্রামের পার্শ্বচিত্র (Profile Of Bareria Village):

বাড়েরিয়া গ্রামটি ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লক ও বাঘমুণ্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত। ২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী বাড়েরিয়া গ্রামটির কোড নাম্বার হল ৩৩১৬১৬১২।

এই গ্রামটি জেলার সদর দপ্তর পুরুলিয়া থেকে ৬৩.৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং সাব-ডিসট্রিক সদর দপ্তর 'পাথার ডিহি' থেকে ১.৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাড়েরিয়া গ্রামের মোট ভৌগোলিক এলাকা হল ১৭০৮.৫৯ হেক্টর। ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী এই গ্রামের মোট জনসংখ্যা হল ৩৯৮২ জন, যার মধ্যে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ২০৪৬ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ছিল ১৯৩৬ জন। তপশীলি জাতির জনসংখ্যা ছিল ৫৯৯ জন, যার মধ্যে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ৩০১ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ছিল ২৯৮ জন। বাড়েরিয়া গ্রামে আদিবাসীদের জনসংখ্যা ছিল ৭৩৮ জন, যার মধ্যে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ৩৭৬ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ছিল ৩৬২ জন। বাড়েরিয়া গ্রামের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৮.৫৪%, যার মধ্যে ৬০.৩১% পুরুষ এবং ৩৬.১১% মহিলা। বাড়েরিয়া গ্রামে মোট জনসংখ্যার নিরক্ষরতার সংখ্যা ছিল ২০৪৯ জন, যার মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৮১২ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ১২৩৭ জন। এছাড়া শিশুদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৮২ জন, যার মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা ৩৫৬ জন এবং মেয়ের সংখ্যা ৩২৬ জন। এই গ্রামে বসবাসের বাড়ির সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৩৭ টি। বাড়েরিয়া গ্রামটি থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরে বলরামপুর ব্লকটি অবস্থিত, এটি হল সবথেকে কাছের শহর এবং সমগ্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্থান। বাড়েরিয়া গ্রাম থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে সরকারি ও বেসরকারি বাস স্টপেজ রয়েছে এবং প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে। বাড়েরিয়া গ্রামের নিকটবর্তী গ্রামগুলি হল শ্রাবন্দি, টানটান, অযোধ্যা, মাতিয়ালা, রাঙ্গা, গসায়ডি, বাঘমুণ্ডি, কুচিররাখা প্রভৃতি। এই গ্রামে একটি বাড়েরিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে এবং একটি সরকারি বাঘমুণ্ডি পলিটেকনিক কলেজ, ১৩২ কেভি বাঘমুণ্ডি এস.এস.টি.এন (WBSETCL), PPSP 11 KV সাবস্টেশন (WBSEDCL) রয়েছে। এই গ্রামটি পাহাড়ের মধ্যে অবস্থান করে তাই এখানে আপার ড্যাম ও লোয়ার ড্যাম রয়েছে, বছরের একটা সময় পর্যটকের আগমন ঘটে।

৩) বেড়সা গ্রামের পার্শ্বচিত্র (Profile of Bersa Village):

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্লকের গেনরুয়া পঞ্চায়েতের অধীনে বেড়সা গ্রামটি অবস্থিত। ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী বেড়সা গ্রামের কোড নাম্বার হল ৩৩১৬৭৪। বেড়সা গ্রামটির সদর দপ্তর বলরামপুর থেকে প্রায় ১২.১ কিলোমিটার এবং জেলা সদর দপ্তর পুরুলিয়া থেকে প্রায় ৪৪.১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বেড়সা গ্রামটির ভৌগোলিক সীমা হল ৫২৪.০৭ হেক্টর। ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী বেড়সা গ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৯০০ জন পুরুষদের জনসংখ্যা ৪৫৮ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ৪৪২ জন। বেড়সা গ্রামে শিশুদের (০-৬ বৎসর) মোট জনসংখ্যা ছিল ১৩১ জন, এর মধ্যে ছেলে শিশুদের জনসংখ্যা ছিল ৫৭ এবং মেয়ে শিশুদের জনসংখ্যা ছিল ৭৪ জন। এছাড়া এই গ্রামে আদিবাসীদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৩২ জন, এর মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ২১৫ এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ২১৭ জন। বেড়সা গ্রামে মোট সাক্ষরতার হার ৪০.৩৩ %, এর মধ্যে পুরুষদের ৫৭.২১% এবং ২২.৮৫% মহিলাদের সাক্ষরতার হার ছিল। বেড়সা গ্রামে নিরক্ষর জনসংখ্যা ছিল ৫৩৮ জন, এর মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ১৯৬ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ৩৪১ জন। বেড়সা গ্রাম থেকে সরকারি এবং বেসরকারি বাস স্টপেজ যথাক্রমে ৫ কিলোমিটার এবং ১০ কিলোমিটার। রেলওয়ে স্টেশনের দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার। বেড়সা গ্রামে নিকটবর্তী গ্রামগুলি হল গিটিং, জুগিদি, কর্মফল, ডাভুডি, সিরিঙ্গি, উলিদি, কানা, আড়রুহাসা, লাহার, কাশিদি, নামশোল, কেরায়া প্রভৃতি। এই গ্রামে একটি বিদ্যালয় আছে, কোন উচ্চবিদ্যালয় নেয়। এছাড়া গ্রামে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেয়।

৪) ডাকাই গ্রামের পার্শ্বচিত্র (Profile of Dakai Village):

ডাকাই গ্রামটি পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১ ব্লকের মাথারি-খামাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত। এই গ্রামটি ঝালদা ব্লক থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে এবং খামাড় হাই স্কুল থেকে প্রায় ৬

কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। মাথারি-খামাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রায় ২১ টি গ্রাম রয়েছে, গ্রামগুলি হল- ছোট ফুহরা, মাথার, ডাকাই, আকাশার, পাল্মা, বড় ফুহরা, কোতিয়া, উহাতু, পরমুরা, দুল্লা, অর্দানা, অলগাড়া, কাসিদি, হুরলং, জজুহাতু, খামার, লক্ষদী, আদালদি, পাঞ্জরি, বাঙ্গাসুর, পোকহরিয়া। ডাকাই গ্রামের তিন দিকে রয়েছে ঘন জঙ্গলে ভরা অযোধ্যা পাহাড়। ডাকাই গ্রামে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ডাকাই গ্রামের শিশুদের ৫-৬ কিলোমিটার দূরে খামার উচ্চ বিদ্যালয়ে যেতে হয়। বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তা ভালো নয়। নির্জন পাহাড়ি চড়াই উৎরাই পথ। মাঝে মাঝে ছোট জঙ্গল আছে। হাতি পালের ভয় রয়েছে। দূরত্ব এবং চূড়ান্ত দারিদ্র্যের কারণে ডাকাই গ্রামের আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী ছেলে মেয়েরা স্কুল ছুট হয়ে যায়। এই গ্রামে প্রায় গোপ, মুড়া এবং বিরহড় পরিবার মিলিয়ে প্রায় ৯০ থেকে ১০০ টি পরিবার রয়েছে। ডাকাই গ্রামে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

সংগৃহীত গুণগত তথ্য এবং বিশ্লেষণ

(Collection of Qualitative Data and its Interpretation)

এই অধ্যায়ে গবেষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (PRA), ফোকাস দল আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করে দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে পুরুলিয়া জেলার তিনটি ব্লকে অর্থাৎ বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর, ঝালদা-১ ব্লকের অধীনে চারটি গ্রামে (ভূপতিপল্লী, বাড়েরিয়া, বেড়সা এবং ডাকাই) বিরহড় আদিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তথ্যগুলিকে উপস্থাপন, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা হল।

গবেষক ভূপতিপল্লী গ্রামের বিরহড়দের কাছ থেকে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (PRA), ফোকাস দল আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন যে সমস্ত তথ্য পেয়েছেন সেগুলি হল-

১) ভূপতিপল্লী গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্য: (Information Gained from Bhupotipolly Village)

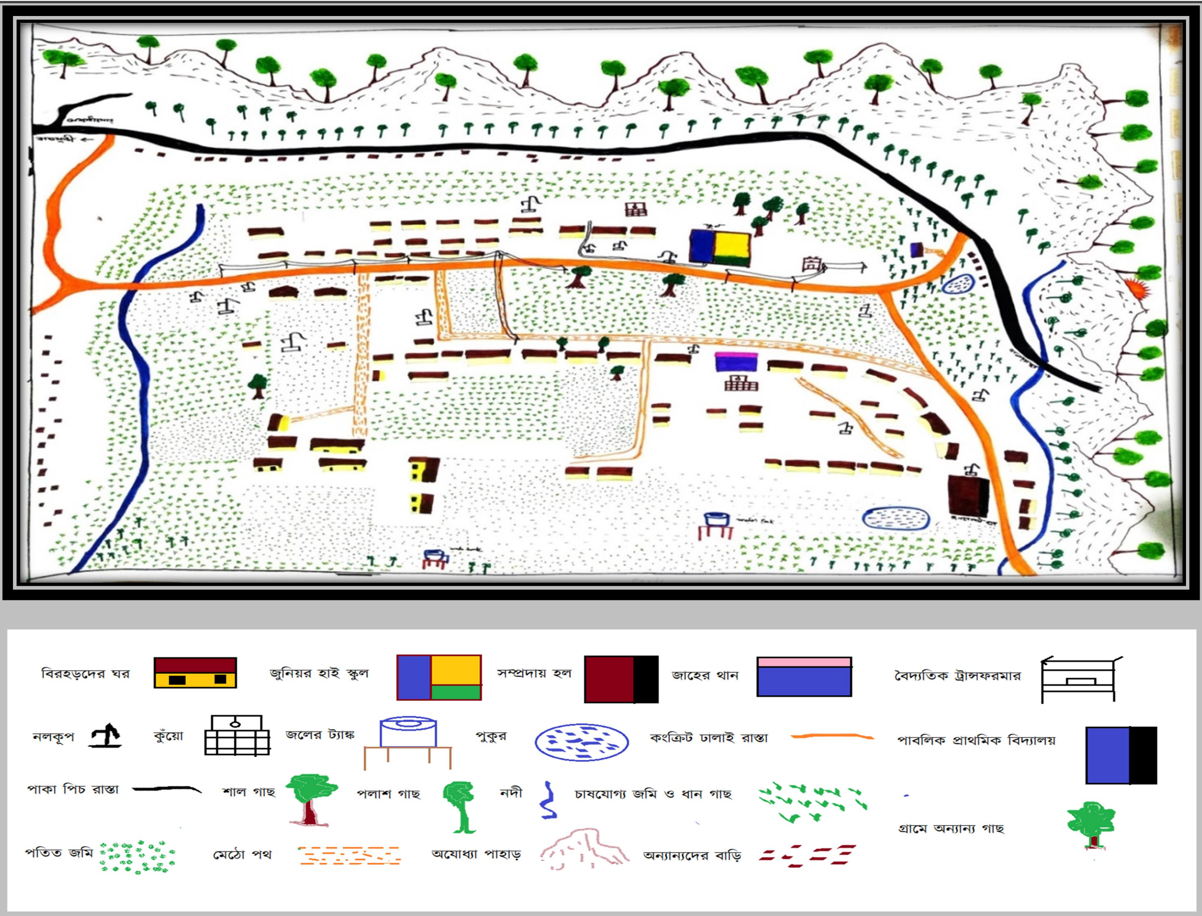

ভূপতিপল্লী

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী ব্লকের ভূপতিপল্লী গ্রামটি প্রধানত আদিবাসী গ্রাম এবং এখানে প্রায় ৭৫ টি বিরহড় গোষ্ঠীর পরিবারের বসবাস করেন। গভীর অরণ্যে উঁচু পাহাড়ে এরা চাষবাস করতেন না কারণ পাহাড়ের রুক্ষ মাটি চাষযোগ্য ছিল না। জীবন নির্বাহের জন্য তাঁরা মূলত শিকার এবং বনজ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডী থানার অধীনে একটি পল্লীর পত্তন ঘটান। এই সময়ে আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার এর নামঅনুসারে পল্লীর নাম রাখা হয় 'ভূপতিপল্লী'। এই ভূপতিপল্লীতেই প্রথম বিরহড় আদিবাসীদেরকে সুউচ্চ পাহাড় (আয়ঃ দ্যা) থেকে প্রায় ৬/৭ কিলোমিটার দূরে ডুয়ার্স অঞ্চলে নামিয়ে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ২৯ টি বিরহড় পরিবারকে মাটির বাড়ি, কিছু গৃহপালিত

পশু, এবং চাষের জমি দেওয়া হয়। তবে বিরহড়দেরকে চাষের জন্য যে জমি দেওয়া হয়েছিল তা অনুর্বর জমি ছিল। তাই এই গ্রামে কিছু কিছু বিরহড়রা তাঁদের জমিতে চাষ করলেও ভালো ফসল ফলাতে তাঁরা অক্ষম। তাই বাধ্য হয়ে এই গ্রামের যুবক যুবতীরা শ্রমসাধ্য কাজ করার জন্য পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দূর দুরান্তে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই গ্রামটির মাঝবরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে একটি কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা রয়েছে। পশ্চিমদিকে যাওয়া রাস্তাটির একটি শাখা বাঘমুণ্ডী ও বলরামপুর পিচ রোডের অযোধ্যা মোড়ের কাছে যুক্ত হয়েছে। এই কংক্রিট ঢালাই রাস্তাটির আর একটি শাখা অর্থাৎ ঢালাই রাস্তা গ্রামের পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে ভূপতিপল্লী গ্রামে জলের জন্য প্রায় ১৪ টি নলকূপের ব্যবস্থা করে দিলেও বেশির ভাগ নলকূপ থেকে ভূ-গর্ভের জল বের হয় না। এই নলকূপগুলি নাম মাত্রই রয়েছে। এছাড়া এই গ্রামের উত্তর দিকে একটি এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একটি বহু পুরনো কুঁয়ো রয়েছে, যেটি ব্যবহার যোগ্য। বিরহড় আদিবাসীরা ভূপতিপল্লী গ্রামের উত্তর দিকে, মধ্য ভাগে, পশ্চিমে ও পূর্বে ঢালু স্থানে অনুর্বর জমিতে চাষ করেন বর্ষার একটি সময়ে। তবে চাষ করলেও ফসল ভালো হয় না। গ্রামের উত্তর-পূর্ব স্থানে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬২ সালে বিরহড় শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি ভূপতিপল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা এই বিদ্যালয়কে জুনিয়ার হাই স্কুলে রূপান্তর করা হয়। এই বিদ্যালয়ে বিরহড় আদিবাসী শিশুরা ছাড়াও সাঁওতাল, মুণ্ডা আদিবাসী শিশুরা পড়াশোনা করেন। এই গ্রামের বিরহড় পরিবার গুলির মধ্যে ২/৩ তিন জন যুবক ও যুবতী বিরহড় শিশুদের সকাল এবং বিকালে পড়াশোনা করান। গ্রামে পূর্ব দিকে একটি ভূপতিপল্লী বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষানিকেতন বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়টি ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এখন বিদ্যালয়টি অর্ধভগ্নাঙ্গ অবস্থায় বন্ধ আছে, কোন লেখাপড়া হয় না। পরিবারের বাবা-মা বা অভিভাবকরা দৈনন্দিন কাজের জন্য ও কাঠ সংগ্রহের জন্য ১০-১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অযোধ্যা পাহাড়ে, জঙ্গলে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে যান। বাড়িতে শিশুগুলিকে বলার মত কেউ না

থাকায় তারা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় খেলাধুলা করে ও ঘুরে বেড়ায়। এই কারণের জন্য ভূপতিপল্লী গ্রামে বিদ্যালয় থাকতেও বিরহড় শিশুরা স্কুল ছুট হচ্ছে। এই গ্রামে বেশির ভাগ বাড়িগুলি সরকারের দ্বারা ইটের তৈরি এবং এজবেস্টর ছাউনি দিয়ে বাড়ি। তবে কিছু মাটির তৈরি দেওয়াল দেওয়া বাড়ি রয়েছে। গবেষক লক্ষ্য করেন বাঘমুণ্ডী ব্লকের তত্ত্বাবধানে 'উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের' অর্থ থেকে ২০১৮-১৯ বর্ষে এই গ্রামে নতুন বাড়িগুলি তৈরি করে দিয়েছে এবং কিছু পুরনো ইঁটের বাড়ি রয়েছে। বিরহড়দের কিছু পরিবার তাঁরা গবাদি পশু হিসাবে গরু, শূকর, ছাগল, মুরগি, হাঁস পোষে। তবে সব পরিবারে এই গবাদি পশু নেই। যখন প্রয়োজন হয় তখন এই গবাদি পশুগুলিকে বিক্রি করে তাঁরা দৈনন্দিন সংসার চালান। কিছু মহিলা এবং পুরুষ প্রায় ৭/৮ কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তা অতিক্রম করে অযোধ্যা পাহাড়ে জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করেন, এই শুকনো কাঠকে মাথায় করে বয়ে এনে বাজারে বিক্রি করে এবং বিক্রয় মূল্য হিসাবে ১৫০-২০০ টাকা তাঁরা পান। কিছু জন অন্যান্য কাজে তাঁরা জেলার বাইরে কাজের জন্য গিয়েছেন। বয়স্ক বিরহড়রা গ্রামের মধ্যে চিহরলতার দড়ি তৈরি ও সিমেন্ট বস্তার দড়ি তৈরি করেন। কিছু যুবক ছেলেরা ট্র্যাক্টর চালায় এবং পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন দোকানে শ্রমিকের কাজ করেন। এই গ্রামে বছরের একটি সময় বাঁধের জল দিয়ে ধান চাষ করা হয়। তবে যথেষ্ট পরিমানে উর্বর জমি না হওয়ার কারণে ভালো ফসল হয় না। ভূপতিপল্লী গ্রামে রুক্ষ মাটির কারণে সবজি চাষ ভালো হয় না এবং মাছ চাষের জন্য ভালো ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি। ভূপতিপল্লী গ্রামে যে সমস্ত উৎসব পালিত হয় সেগুলি হল- 'সস বোঙ্গা' পরব, এটি আষাঢ় মাসে ধান রোপণের পরই ফসল যাতে ভালো হয় তার জন্য প্রকৃতি পূজা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে 'সস বোঙ্গা' উৎসব পালিত হয়। পৌষ মাসের শুক্লপক্ষে যে কোন দিন বিরহড় আদিবাসীরা 'সহরায়' উৎসব পালন করে, এই উৎসবে গরু, মোষকে তাঁরা সযত্নে লালন পালন করেন। ভূপতিপল্লী গ্রামে বিরহড়দের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ, উৎসব অনুষ্ঠান, বিবাহ, সামাজিক অন্যায় থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব মোড়লের উপর বা মাঝির উপর, বিরহড়দের ভাষায় একে 'ন্যায়া' বলে। ন্যায়া বলেন এই গ্রামে তিনিই ব্যবস্থাপনা করেন,

যেমন গ্রামের ভালো, মন্দ তিনি দেখেন এবং গ্রামের বিকাশ থেকে শুরু করে অনেক কিছু। গবেষক দেখেন যে গ্রামে কয়েকটি নলকূপের সাথে সরকার সোলার প্যানেল যুক্ত সাবমার্সাল ও জলের ট্যাঙ্ক তৈরি করে দিয়েছে জলের সমস্যা সমাধানের জন্য। তবে সরকার চাষযোগ্য জমি দেয়নি, এছাড়া বসবাসের জন্য কোন ফাঁকা জায়গা দেয়নি। যাতে বিরহড় পরিবাররা বাড়ি তৈরি করে ভালোভাবে বসবাস করতে পারেন। সময়ের সাথে সাথে বিরহড় পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু জায়গার পরিমান বাড়েনি।গবেষক বিরহড় যুবক ও ন্যায়াকে জিজ্ঞাসা করেন আপনাদের পূর্ব পুরুষরা কোথায় ছিল? গবেষক উত্তরে জবাব পান যে বিরহড়দের পূর্ব পুরুষরা অযোধ্যা পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে স্বাধীন ভাবে বসবাস করতো। তবে পুনর্বাসনের ফলে তাঁদের সাথে অন্যায় হয়েছে কারণ তাঁদের অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।বিরহড় ন্যায়া ও যুবক বলেন যে গ্রামে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই, চিকিৎসার জন্য বাঘমুণ্ডি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। তবে বেশিরভাগ তাঁদের প্রাচীন পরম্পরাগত ভেষজ ওষধি গাছ গাছড়া থেকে তাঁরা তাঁদের রোগের চিকিৎসা করেন। তবে এখন ধীরে ধীরে তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

২) বাড়েরিয়া গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্য: (Information Gained from Bareria Village):

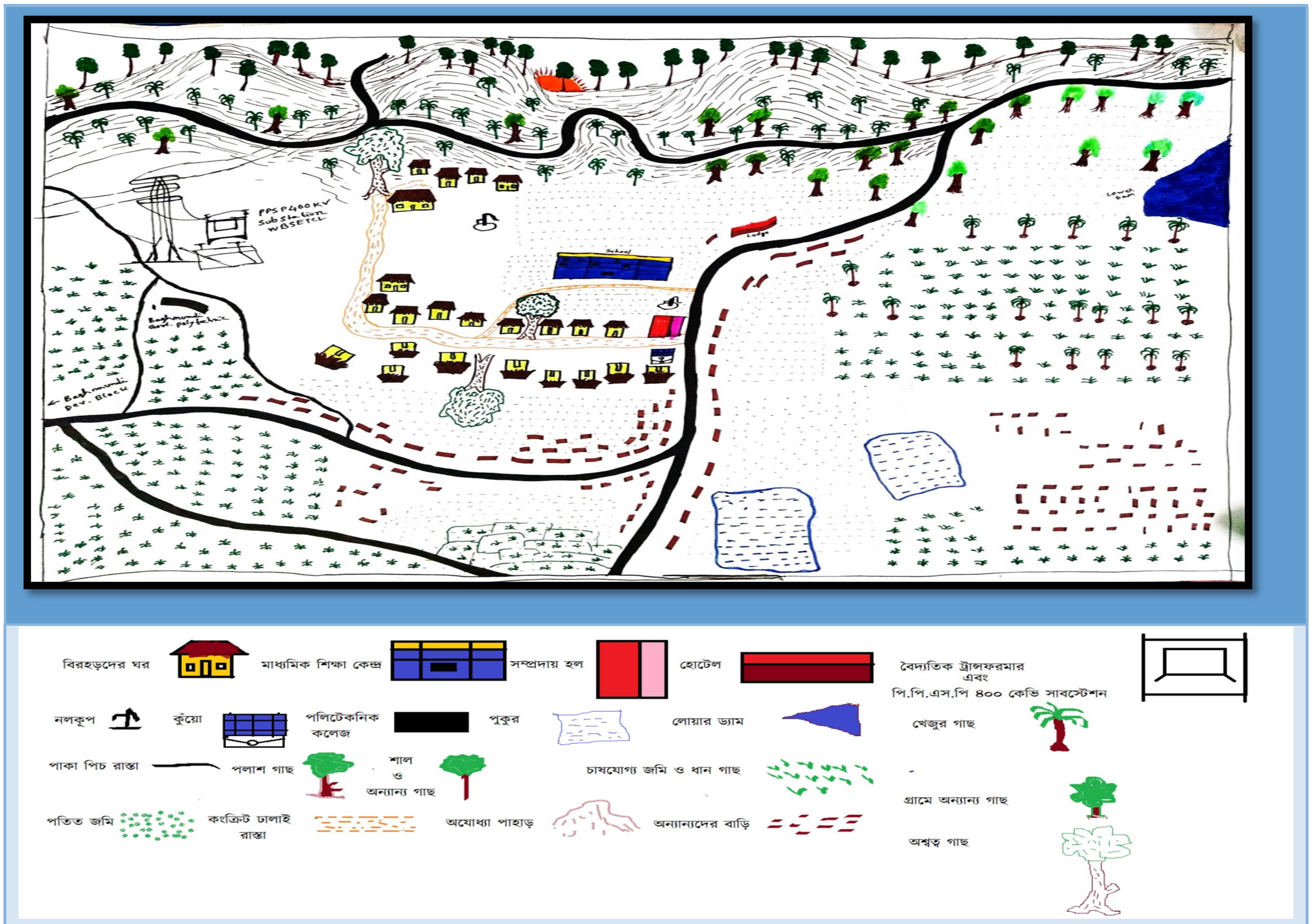

বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় কলোনি

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী উন্নয়ন ব্লকের অধীনে অযোধ্যা পাহাড়ের ঢালে বা শিরায় বাড়েরিয়া গ্রামটি অবস্থিত। বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় আদিবাসীদের ১৮ টি পরিবার বসবাস করেন। এই গ্রামে বিরহড়দের গ্রামের দক্ষিণে একটি পাকা পিচ রাস্তা রয়েছে, এটির একটি অংশ পূর্ব-দক্ষিণে লোয়ার ড্যাম হয়ে অযোধ্যা পাহাড়ে চলে গেছে, আর একটি অংশ পশ্চিম দিকে কিছুটা গিয়ে উত্তর দিক হয়ে বাঘমুণ্ডী ব্লকের দিকে চলে গেছে। বাড়েরিয়া গ্রামের পশ্চিমে অন্যান্য কিছু আদিবাসী এবং সাধারণ মানুষ জন বসবাস করেন। এই গ্রামের বিরহড়দের সাথে কিছু ‘মুড়া’ (মুণ্ডা) পরিবারও বসবাস করেন। বিরহড় আদিবাসীদের গ্রামের পানীয় জলের জন্য দুইটি কুঁয়ো রয়েছে, তবে একটি কুঁয়ো

নিস্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ শুকিয়ে গিয়েছে। এছাড়া দুইটি নলকূপ রয়েছে তবে গ্রীষ্ম কালে জলের স্তর একে বারে নিচে চলে যায়। বিরহড় শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি জুনিয়র হাই স্কুল রয়েছে।

বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য একটি সম্প্রদায় হল বা কমিউনিটি হল (Community Hall) রয়েছে। বিরহড় আদিবাসীদের কমিউনিটি হলের পাশ দিয়ে বিরহড় আদিবাসীদের দুই দিকের বাড়ির মাঝ বরাবর (কুলহি) বাঘমুণ্ডী উন্নয়ন ব্লকের তত্ত্বাবধানে পিভিটিজি গ্রুপ (PVTG) এর তহবিল থেকে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। বিরহড়দের বাড়িগুলি পূর্বে মাটির ছিল তবে বাঘমুণ্ডী উন্নয়ন ব্লকের তত্ত্বাবধানে ২০১৫-১৬, ২০১৮-১৯ বর্ষে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের (BCW) তহবিল থেকে ইট দিয়ে তৈরি পাকা দেওয়াল বাড়ি এবং এ্যাজবেস্টর দিয়ে ছাউনি রয়েছে। তবে এখনও মাটির দেওয়াল এবং টালি দিয়ে ছাউনি ঘর বিরহড়দের রয়েছে সাথে কিছু মুড়া পরিবারদেরও একই ব্যবস্থা। এই বাড়েরিয়া গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছালেও বিরহড়দের ঘরে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। বিরহড় আদিবাসীরা পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই সমান ভাবে পরিশ্রম করেন। তাঁরা কঠিন সূউচ্চ পাহাড় পায়ে হেঁটে পার করে জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করেন। এরপর তাঁরা জঙ্গল থেকে এনে বাজারে বিক্রি করেন, বিক্রয় মূল্য হিসাবে ১৫০-২০০ টাকা পান। বিরহড়রা কখনও কাঁচা বা জীবন্ত গাছ কাটেন না, জঙ্গলে যে গাছগুলি মারা গিয়ে শুকিয়ে গেছে ও গাছের শাখা প্রশাখা রয়েছে সেগুলি তাঁরা কেটে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন।

বিরহড়রা জঙ্গল থেকে চিহরলতা, মধু, মোম, কাজু বাদাম, কাঠ বাদাম, মহুয়া, টক জাতিয় ফল, শাল পাতা, ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। বর্তমানে ব্যবহৃত সিমেন্টের বস্তা থেকে প্লাস্টিক সুতো বার করে দড়ি তৈরি করেন, যেটি স্থিতিশীল উন্নয়নে একটি বিশেষ নিদর্শন। এছাড়া জঙ্গল থেকে বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড়দের বসতির কাছাকাছি শাল, পলাশ, নিম, খেজুর, বেল, বাঁশ, হরিতকী, কন্দ, বট, কূল, কাঠ বাদাম, অশ্বথ, মেহগিনি ইত্যাদি গাছ রয়েছে। জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ ছাড়াও জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা শিকার করতে যান, শিকার হিসাবে শূকর, বুনো বিড়াল, সজারু, কাঠবিড়ালি, মেঠো ইঁদুর, হাঁস, মুরগি

ইত্যাদি শিকার করেন। গভীর জঙ্গলে হরিণ রয়েছে কিন্তু বিরহড়রা হরিণ শিকার করে না। বিরহড়দের নিজস্ব কোন চাষ যোগ্য জমি না থাকার জন্য তাঁরা চাষ করতে পারেন না। তবে কিছু বিরহড় মহিলারা ১৫০-২০০ টাকার মূল্যে অন্যান্যদের জমিতে ক্ষেতমজুর হিসাবে কাজ করেন। বছরের একটি সময়ে যখন অরণ্যকন্যা অযোধ্যা পাহাড়ে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পর্যটকের আগমন ঘটে তখন বাড়েরিয়া গ্রামের সাধারণ মানুষদের কিছু আমদানি হলেও বিরহড়দের কোন অর্থ উপার্জন হয় না। বাড়েরিয়া গ্রামে ও পাশের পর্যটন কেন্দ্রের স্থানে ছোট খাটো মেলা, খাবারের ও অন্যান্য দোকান বসে। সেই পর্যটন কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সাধারণ মানুষরা বিরহড়দের কোন রকম দোকান দিতে বা পর্যটকদের পাহাড় ঘোরানোর কাজ করতে দেয় না। অযোধ্যা পাহাড়, জঙ্গল ও প্রকৃতিকে জঙ্গল মাফিয়া, পুঁজিপতি কোম্পানি, সরকারের দালালরা জঙ্গল, পাহাড় ধ্বংস করে প্রাকৃতিক সম্পদকে লুঠ করার ষড়যন্ত্র করছে এবং অযোধ্যা পাহাড়ে বার বার আঘাত করার চেষ্টা করছে, তাঁদের বিরুদ্ধে বাড়েরিয়া গ্রামের সকল বিরহড় আদিবাসী মানুষরা মাঝিদের অর্থাৎ সাঁওতালদের সঙ্গ দিয়ে প্রকৃতিকে ও প্রকৃতির সম্পদকে, জীবজগতকে রক্ষার জন্য বহুবার লড়াই ও বিক্ষোভ সমাবেশে যোগদান করেছেন। বাড়েরিয়া গ্রামে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্কুল এবং একটি পলিটেকনিক কলেজ রয়েছে। এই স্কুলে পঠন পাঠন হিসাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া হয়। বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন। এই বিদ্যালয়টির নাম হল গয়াসুর মাহাত স্মৃতি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, স্থাপিত হয়েছে ২০০৮ সালে। বিরহড় পরিবার থেকে কেবলমাত্র দুইটি মেয়ে বাঘমুণ্ডী বালিকা বিদ্যালয়ে (মাধ্যমিক) লেখাপড়া করেন। বাড়েরিয়া গ্রামে একটি মাত্র বিরহড় পরিবার থেকে একটি মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের ‘মানভুম মহাবিদ্যালয়ে’ লেখাপড়া করেন। বাড়েরিয়া গ্রামের বিরহড় আদিবাসীদের সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটার কার্ড থাকলেও বেশির ভাগ বিরহড়দের আধার কার্ড, জব কার্ড, রেশন কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাংক বই নেই। বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় আদিবাসী পরিবারে সাংবিধানিক অধিকার শংসাপত্র (Scheduled Tribe Certificate) একটি

পরিবারে পায়। এছাড়া আর কোনো পরিবারে নেই। বিরহড় ভাষাটি খেরওয়াল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডাশাখা ভাষা গোষ্ঠীর অংশ। বিরহড় ভাষার সাথে অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষার মিল দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি হল সাঁওতাল, হো এবং মুণ্ডা আদিবাসী ভাষা। তবে সাঁওতালদের অনেকটা কাছের বিরহড় ভাষা, তাই সাঁওতালদের সাথে গোত্রগত মিল দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামের বিরহড়দের কিছু শারীরিক সমস্যা হলে বর্তমানে তাঁরা বাঘমুণ্ডীর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান। তবে এই গ্রামের কিছু বয়স্ক বিরহড় মানুষরা জঙ্গল থেকে ওষধি গাছ গাছড়ার মূল, ফুল-ফল, বীজ, পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করেন, তাঁরা পরম্পরাগত প্রাচীন পদ্ধতির মাধ্যমে ওষধি উপকরণ তৈরি করেন এবং রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করেন। বাড়েরিরা গ্রামে বিরহড়দের সাপে কামড়ালে তাঁরা ওঝা, বা গুনিনের কাছে না গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এক দিক থেকে তাঁরা বর্তমান সময়ের চিকিৎসা বিদ্যাকে গ্রহণ করেছেন সাথে সাথে তাঁদের প্রাচীন সংস্কৃতিকেও টিকিয়ে রেখেছেন। বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের কিছু নিজস্ব উৎসব অনুষ্ঠান রয়েছে তবে বিশেষ উৎসব পরবগুলি হল সারহুল, বাহা, কারাম ইত্যাদি।

৩) ডাকাই গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্য: (Information Gained from Dakai Village):

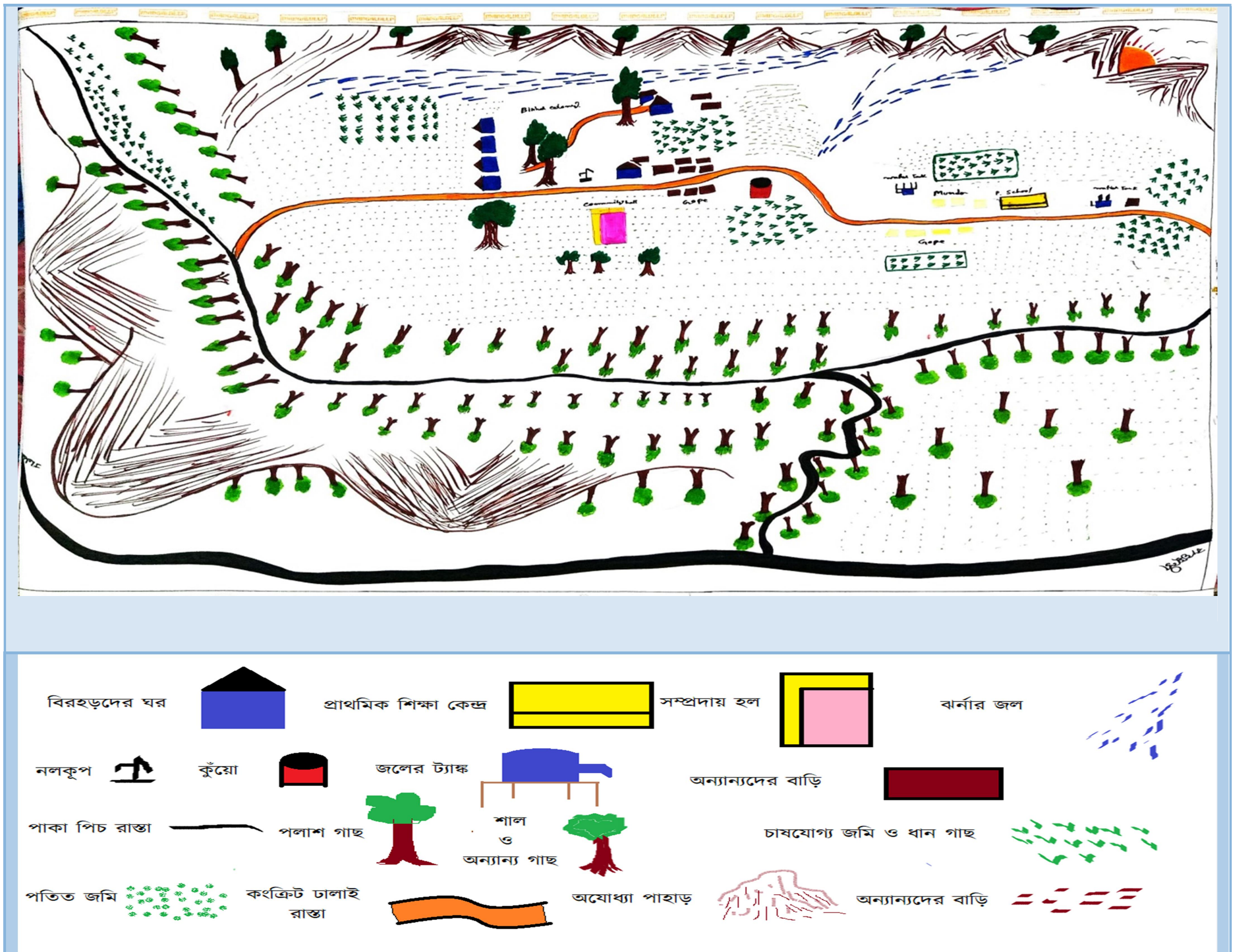

ডাকাই গ্রাম

ডাকাই গ্রামটি পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১ ব্লকের অধীনে খামার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। এই গ্রামে তিনটি বিরহড় আদিবাসী পরিবারের বসবাস। যদিও দুইটি পরিবার একটি করে মাত্র পুরুষকে নিয়ে গঠিত। ঐ দুইটি পরিবারে কোন মহিলা বা শিশু নেই। অন্য পরিবারে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা প্রাপ্ত বয়স্ক আর চারটি সন্তান রয়েছে। চারটি সন্তানের মধ্যে তিনটি সন্তান কন্যা সন্তান আর একটি পুরুষ সন্তান রয়েছে। একটি মাত্র পরিবারের একটি প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা রয়েছেন যিনি সরকারের থেকে কোন অর্থ পান না। তাঁরা রেশন পান না কারণ তাঁদের রেশন কার্ড নেই। সরকার সকলের জন্য জব কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড, লক্ষ্মী ভাণ্ডার, সম্প্রদায় শংসাপত্র, প্যান কার্ড

ইত্যাদি তৈরি করে দেননি। পরিবারের দুই পুরুষ ৩০-৩৫ বছর বয়স হলেও এখনও তাঁরা বিয়ে করেননি চূড়ান্ত দারিদ্র্যের কারণে ও তাঁদের গ্রামে কোন বিবাহ যোগ্য বিরহড় মেয়ে নেই বলে। তাছাড়া বিয়ের জন্য যেমন ব্যয় রয়েছে এবং ভাবি স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়াবার ও লালন পালন করার জন্য সামর্থ্য তাঁদের নেই, তাই বিয়ের স্বপ্ন তাঁদের কাছে অধরা থেকে গেছে। বিরহড়দের বাড়িগুলি থেকে কিছুটা পূর্ব দিকে 'মুড়া' আদিবাসী এবং গোপ বা গোয়ালাদের বাড়ি রয়েছে। ডাকাই গ্রামে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২০০ জন। বিরহড়দের সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচটি ইটের দেওয়াল যুক্ত এজবেস্টর ছাউনি সহ পাকা ঘর করে দেওয়া হয়েছে। ডাকাই গ্রামে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিবারের কোন চাষযোগ্য জমি নেই এবং সরকারের থেকে কোন চাষযোগ্য জমি তাঁদের দেওয়া হয়নি। তাঁরা বর্ষার সময়ে কিছু সবজি ও ধান চাষ করেন। পাহাড়ের উপর এবং সংলগ্ন জমি হওয়ায় বর্ষাকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে জলের অভাবে চাষ করা যায়না। পুরুলিয়া জেলা গ্রীষ্ম ঋতুতে রুক্ষ প্রকৃতির, এই সময় ঝালদা সমেত ডাকাই গ্রামেও পানীয় জলের সমস্যা প্রখর হয়ে ওঠে। ডাকাই গ্রামে জলের সমস্যা একটি বড় সমস্যা, তাই গ্রামবাসী এখানে ভালোভাবে চাষবাস ও হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরু, লালন পালন করতে পারেন না। এই গ্রামের মানুষদেরকে তাই জীবন ও জীবিকার জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভর করতে হয়। জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে এবং জ্বালানির জন্য জঙ্গল থেকে বিরহড় এবং মুড়ারা শুকনো ঝাটি পাটি সংগ্রহ করে। এই গ্রামে পলাশ, অশ্বথ, বাঁশ, বেল, নিম, কদম, কন্দ, শাল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। তবে কাঁচা গাছ বা জীবন্ত গাছ এরা কাঠেন না। ডাকাই গ্রামের উত্তর-পূর্বে যে পাহাড় এবং ঘন জঙ্গল রয়েছে সেখানে ভেষজ গুনযুক্ত ওষধি গাছগাছড়া রয়েছে। তবে বর্তমানে ভেষজ গাছগাছড়া গুলির সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। ডাকাই গ্রামে বিরহড়দের বাড়িগুলি থেকে দক্ষিণ-পূর্বে কিছুটা দূরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র রয়েছে। ডাকাই গ্রাম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রায় ৬-৭ কিলোমিটার দূরে খামার গ্রাম পঞ্চায়েত এর কাছে অবস্থিত। বিরহড় পরিবারের পুরুষ এবং মহিলারা কেউই প্রাথমিক শিক্ষা পায়নি। একটি পরিবারে চারটি শিশুর

মধ্যে একজন পঞ্চম শ্রেণিতে (ছেলে), একজন তৃতীয় শ্রেণিতে (মেয়ে), একজন প্রথম শ্রেণিতে (মেয়ে), আর একজন অঙ্গনওয়ারীতে (মেয়ে) লেখাপড়া করে। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও হাই স্কুল খামার গ্রামে হওয়ার জন্য অনেক গোপ এবং মুড়া পরিবারের শিশুরা স্কুল ছুট হয়েছে। কারণ হাই স্কুল এ যাওয়ার পথটি চড়াই উতরাইতে অর্থাৎ পাহাড়ি পথ হওয়ায় তারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগ্রহ হারায় এবং দরিদ্রতা একটি অন্যতম কারণ। বিরহড়রা বহু বছর পূর্বে ডাকাই গ্রামের জঙ্গলে ওষধি গাছপালা দিয়ে তাঁদের পরম্পরাগত পদ্ধতিতে রোগনিরাময়ের জন্য চিকিৎসা করতেন। বর্তমানে পুরোটাই তাঁরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। তবে এই গ্রামে কেউ কুষ্ঠ রোগে এবং যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়নি। গবেষক বিরহড়দের বাড়িতে প্রবেশ করে দেখেন যে বিরহড়রা তাঁদের জিনিস পত্রগুলি চারিপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। আসবার পত্রের মধ্যে স্টিল গ্লাস, বাটি, থালা, খুন্তি, চামচ এছাড়া অ্যালুমনিওমের থালা, মাঝারি বড় বাটি, বালতি, হাড়ি, ও মাটির হাড়ি, কলসি ইত্যাদি রান্নার জিনিস পত্র রয়েছে। রয়েছে শিকার ধরার জাল, মাছ ধরার জাল, তীর-ধনুক, বাটুল, কোদাল, কুড়ুল, কাটারি, শাবল ইত্যাদি।

গবেষক গোপ গোয়ালাদের কয়েক জন বয়স্ক বাক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকারে কথা বলে জানতে পারেন যে বিরহড় পরিবারগুলির সাথে সাথে মুড়া আদিবাসী পরিবার এবং অন্যান্যরা দারিদ্র্যের সাথে দিন কাটাচ্ছেন। সরকারী সুবিধা ঠিক মতো তাঁরাও পাননা। গবেষক আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন তা হল এই গ্রামটি কেউ জানত না অর্থাৎ পাহাড়ের উপর জঙ্গলের মধ্যে এতোগুলো পরিবারের বসবাস তা সরকারের কাছে কোন রেকর্ড ছিল না। মাওবাদীদের আন্দোলনের চাপে এই গ্রামের পরিচিতি এবং কিছুটা বিকাশ হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিদ্যুৎ সংযোগ, জল, রাস্তা, সরকারী বাড়ি, পানীয় জলের জন্য নলকূপ ইত্যাদি সরকার থেকে তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের দ্বারা কোন রকম কর্ম সংস্থান করে দেওয়া হয়নি।

৪) বেড়সা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্য: (Information Gained from Bersa Village):

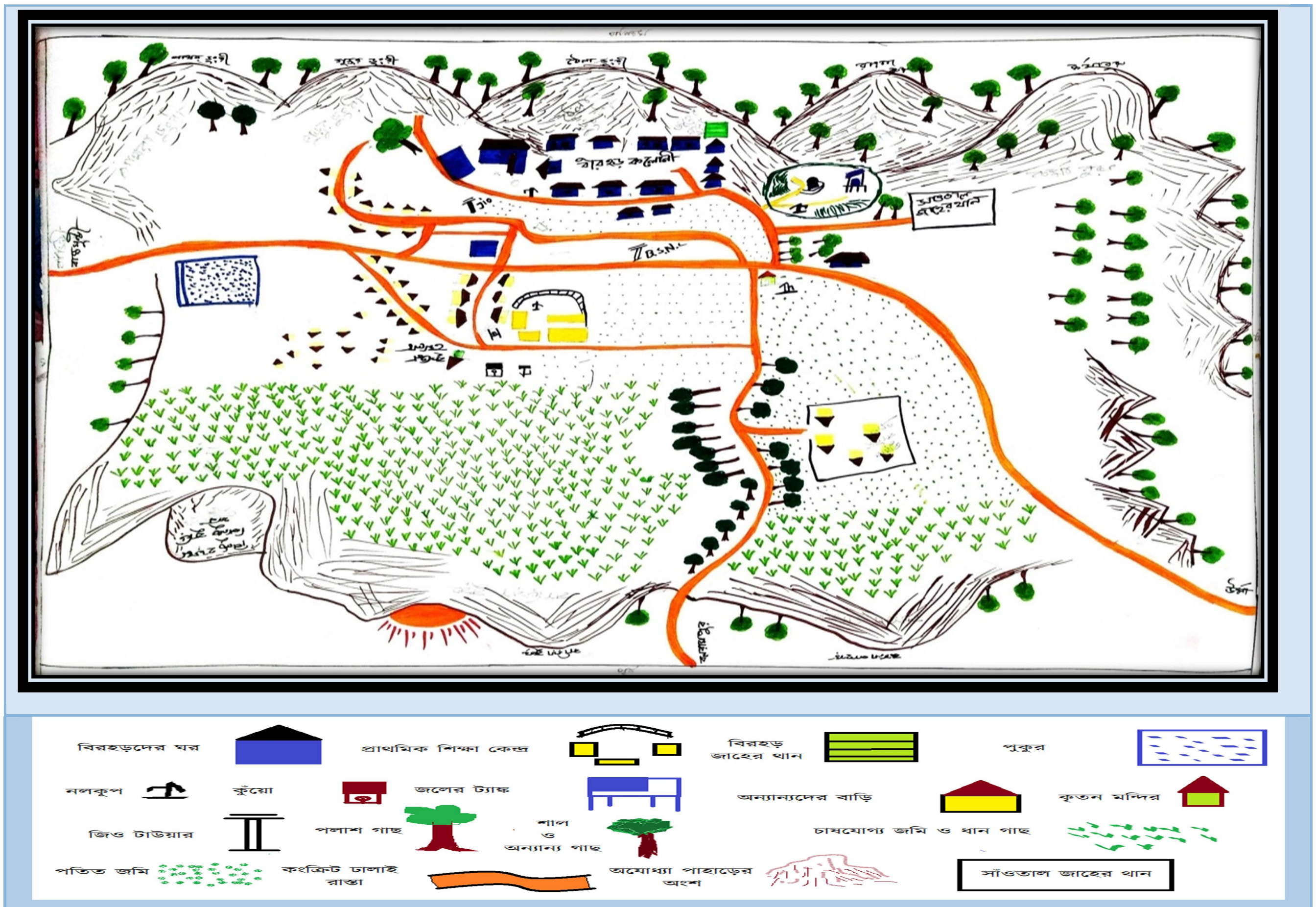

বেড়সা গ্রাম

পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর উন্নয়ন ব্লকে বেড়সা গ্রামটি রয়েছে। বলরামপুর মহকুমা থেকে বেড়সা গ্রামটির দূরত্ব প্রায় ১২-১৩ কিলোমিটার। বেড়সা গ্রামটির চারপাশ সুউচ্চ পাহাড় দ্বারা ঘেরা এবং এই গ্রামটির কিছু অংশ পশ্চিম দিকে পাহাড়ি ঢাল ও পাহাড়ের শিরায় জনবসতি। বহু পূর্ব কাল থেকে বিরহড়দের পূর্বপুরুষরা ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ অযোধ্যার গভীর জঙ্গলে ও পাহাড়ে বসবাস করতেন, বর্তমানে বিরহড়রা পাহাড়ের ঢালে বসতি স্থাপন করেছেন। এই গ্রামটির পূর্ব দিকে একটি রাস্তা উঁচু পাহাড়ের (কানা পাহাড়) পাশ দিয়ে বলরামপুর ব্লকে বা মহকুমায় চলে গেছে। কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অর্থাৎ উর্মা থেকে পাহাড়ের গা দিয়ে বেড়সা গ্রামে প্রবেশ করে দক্ষিণ দিকে 'পাথরা ডুংরি' পাহাড়ের ঢাল হয়ে বাঘমুণ্ডী ব্লকের দিকে চলে গেছে। বেড়সা গ্রামটির

পশ্চিম দিকে ‘ঢেলা ডুংরি’ পাহাড়ের ঢালে ও শিরায় বিরহড়দের কলোনি রয়েছে অর্থাৎ ঘরবাড়িগুলি রয়েছে। বিরহড়দের বাড়িগুলি থেকে ঠিক উত্তর দিকে ‘ঠেলা ডুংরির’ ঢালে বিরহড়দের ‘জাহের থান’ রয়েছে। এবং কিছুটা দূরে নিচের দিকে উত্তরে সাঁওতালদের ‘জাহের থান’ রয়েছে। বেড়সা গ্রামের পূর্ব দিকে ও উত্তর-পূর্বে বর্ষাকালে ধান চাষ হয়। তবে এই অঞ্চলটি অনেকটা পাথর মাটি হওয়ার জন্য এখানে গ্রীষ্মকালে জলের সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। তাই নলকূপ থেকে জল ওঠে না। বিরহড়দের কলোনির দক্ষিণে একটি প্রায় ২০-৩০ ফুট গর্ত পুকুর খনন করা হয়েছে বর্ষার জল সংরক্ষণের জন্য এবং মাছ চাষ করার জন্য যাতে বিরহড়রা মাছ চাষ করে অর্থনৈতিক ভাবে সবল হতে পারেন। এই পাহাড়ে শাল, নিম, অশ্বত্থ, ইত্যাদি গাছ রয়েছে। এই গ্রামে ঢালাই রাস্তা বরাবর দুই দিকে আকাশমণি, শিরিশ, পলাশ, নিম ইত্যাদি গাছ রয়েছে। গবেষক জানতে পারেন বেড়সা গ্রামে বিরহড়দের মূল অর্থনীতি এবং পেশা হল জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করা। বিরহড়রা শুকনো কাঠগুলিকে মাথায় করে খাড়া পাহাড় পার হয়ে প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার পথ হেঁটে বলরামপুর বাজারে কাঠ বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন। এছাড়া মধু সংগ্রহ করেন এবং চিহরলতা থেকে দড়ি তৈরি করেন, এছাড়া বর্তমানে সিমেন্ট বস্তা থেকে দড়ি তৈরি করেন। এই গ্রামে বিরহড়রা অতি দরিদ্রের কারণে কিছু বিরহড় পুরুষরা বলরামপুর, পুরুলিয়া বাজারে বিভিন্ন দোকানে মজুর হিসাবে কাজ করেন এবং কিছু পুরুষরা জেলার বাইরে মজুর হিসাবে কাজে গেছেন। তাই গ্রামে বিরহড়দের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে, বর্তমানে বেড়সা গ্রামে ৯-১০ টি বিরহড় পরিবার রয়েছে। বিরহড়রা গবেষককে জানিয়েছেন যে বলরামপুর ব্লকের তত্ত্বাবধানে ইটের বাড়ি, নলকূপ তৈরির সাথে সাথে বর্তমানে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে বিরহড়রা তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্য ভারতীয় আদিবাসী সংস্কৃতিকে চর্চার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। বেড়সা গ্রামে বিরহড়দের সাংস্কৃতিক হল রয়েছে যেখানে তাঁরা প্রাচীন আদিবাসী বাদ্যযন্ত্রগুলিকে সুসজ্জিত রেখেছেন এবং যাতে বাদ্যযন্ত্রগুলির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বিরহড় সংস্কৃতিকে পরম্পরাগত ভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে শিখিয়ে যেতে পারেন তার ব্যবস্থাও করেছেন।

এই গ্রামে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় (চতুর্থ শ্রেণী) রয়েছে, গ্রামে কোন উচ্চবিদ্যালয় নেই। উচ্চবিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য গ্রামের সকল শিশুদের বা শিক্ষার্থীদেরকে প্রায় ১০ কিলোমিটার পাহাড়, জঙ্গল ও নির্জন পথ অতিক্রম করে বলরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে যেতে হয়। এছাড়া উচ্চশিক্ষা লাভ তাঁদের কাছে একটা স্বপ্ন। বিরহড় কলোনিতে একটি বেসরকারি ছোট ‘অলচিকি’ শিক্ষানিকেতন রয়েছে অর্থাৎ বিরহড়দেরকে ‘অলচিকি’ শেখানো হয়। ২/৩ জন শিক্ষক, শিক্ষিকা তাঁদের নিজেদের প্রচেষ্টায় বিরহড় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসেন। গবেষক জানতে পারেন যে এখনও পর্যন্ত বিরহড়রা মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেনি। অতি দারিদ্র্যের কারণে স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছে। বহু পূর্বে এই গ্রামে বিরহড়রা পদবি হিসাবে ‘শিকারি’ পদবি ব্যবহার করতেন। কারণ বিরহড় মানুষেরা শিকার করতেন বলে তাঁদেরকে শিকারি হিসাবে ডাকার ফলে সরকারি শংসাপত্রে শিকারি পদবি লিখে দিত সরকারি কর্মচারীরা, তবে বর্তমানে বিরহড়রা এই পদবীর বিরোধিতা করেছেন। সরকারকে বলেছেন যে তাঁদের পদবী যাতে ‘বিরহড়’ লেখা হয়। তাই বর্তমানে বিরহড়দের পদবী ‘বিরহড়’ লেখা হচ্ছে। বেড়সা গ্রামে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। গবেষক বিরহড়দের সাথে কথোপকথনে জানতে পারেন যে কেউ যদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তাকে বলরামপুর বা বাঘমুণ্ডী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হবে। তবে বিরহড়দের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, তাঁরা গভীর জঙ্গল থেকে ভেষজ ওষধি গাছগাছড়া দিয়ে তাঁদের রোগ নিরাময় করেন যেমন- জর, সর্দি, কাশি, চামড়ার কোন রোগ, চুলকানি, অ্যালার্জি, পেটে ব্যাথা, শরীরে ব্যাথা/ যন্ত্রণা, ইত্যাদি। তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতির সহায়তায় প্রাচীন কাল থেকে পরম্পরাগত ভাবে গভীর জঙ্গলে ও পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁদের জীবনধারা অতিবাহিত করে চলেছেন। তবে বিরহড়রা গবেষককে জানিয়েছেন যে বর্তমানে ফরেস্ট অফিসাররা তাঁদেরকে গভীর জঙ্গলে যেতে দেননা এবং অনুমতি না পাওয়ার জন্য সামনের পাহাড়, জঙ্গলে ভেষজ উদ্ভিদ না পেয়ে তাঁদের চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে ধীরে ধীরে তাঁদের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি পরবর্তী প্রজন্মকে দিতে অসমর্থ হচ্ছেন। বিরহড়রা গবেষককে জানান যে বিভিন্ন

জঙ্গল মাফিয়া, পুঁজিপতি, এমনকি ফরেস্ট অফিসাররাও এই জঙ্গল/ অরণ্যকে ধ্বংসের জন্য ও জঙ্গলের সম্পদকে লুঠ করার জন্য অনেক বার চেষ্টা করেছিল এবং অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে শেষ করেছে। তবে বিরহড়, সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসী সংগঠন জঙ্গল এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য জঙ্গল মাফিয়াদের সাথে লড়াই করেছেন, এমনকি বহুবার আন্দোলন করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বিরহড়দের ঐতিহাসিক পটভূমি

(Historical Background of Birhors)

৫.১ ভারতে বিরহড়দের সম্বন্ধে একটি সাধারণ ঐতিহাসিক পটভূমি (A General Historical Background of the Birhors):

ভারতের মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহার, ছত্রিশগড় এবং পশ্চিমবঙ্গে আদিম অধিবাসী বিরহড় আদিবাসীকে পাওয়া যায়। এই সবকটি রাজ্যেই বিরহড়রা Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র পুরুলিয়া জেলায় বিরহড়রা বসবাস করেন। ‘বির’ শব্দটির অর্থ ‘জঙ্গল’ এবং ‘হড়’ শব্দটির অর্থ ‘মানুষ’। সুতরাং ‘বিরহড়’ শব্দটির অর্থ হল ‘জঙ্গলের মানুষ’ বা ‘বন্য সন্তান’। বিরহড়রা পূর্বে যাযাবর গোষ্ঠী ভুক্ত ছিলেন - এদের কোন স্থায়ী ঘরবাড়ি, বাসস্থান ছিল না এবং দল বেঁধে জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন। জঙ্গলে কোন এক প্রান্তে তাঁরা জঙ্গলের লতাপাতা দিয়ে সাময়িক ছাউনি করে তার মধ্যে বসবাস করতেন।

ইংরেজ আমলে এবং তারও পূর্ব থেকে ঝাড়খণ্ডে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বিরহড়রা যাযাবরের ন্যায় জঙ্গলে বাস করত। ঐ সময় কালে বিরহড়রা নরমাংস খেত (Dalton, 1872) [১৮৫৭-১৮৭৫ সাল পর্যন্ত Dalton ছোটনাগপুর মালভূমি ডিভিশনে কমিশনার পদে ছিলেন।] Dalton লিখেছেন, “With murch trouble some Birhors were caught and brought to me. They were wretched-looking objects, but had more the appeared of the most abject on of one of those degraded castes of the Hindus, the dones or pariahs, to who must flesh in food, them of hill people. Assuring me that they had themselves given up the practice, they admitted that they are fathers were in the habit of disposing of the dead in the mamer indicated, viz., by feasting on the bodies: but they declared they never

shortened life to provide such feast. And shank with horror at the idea of any bodies but those of their own blood-relations being surved upto them!” ঐ সময়ে যশপুরের রাজাও ডালটনকে বলেছিলেন যে তিনি শুনেছেন, যখন কোন বয়স্ক বিরহড় ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না, মৃত্যু আসন্ন, তখন তিনি তাঁর নিকট রক্ত সম্পর্কের বিরহড়দের আহ্বান করতেন যে তাঁরা যেন তাকে হত্যা করে তাঁর মাংস খায় এবং তাঁদের ক্ষুধার নৃবৃত্তি ঘটায়। যদিও যশপুরের রাজা একথাও বলেছিলেন যে তাঁর কাছে যে সকল বিরহড়কে আনা হয়েছিল তাঁরা কেউ নরমাংস খাওয়ার কথা স্বীকার করেনি।

১৮২৪ সাল থেকে ১৮২৫ সালে Mr. Henry Paddington যখন পালামৌর দক্ষিণ অঞ্চলে কফির চারা বসানোর কাজে সরকারের থেকে দায়িত্ব পেয়েছিলেন সেই সময়ে তিনি দু’জন বিরহড় যাযাবর গোষ্ঠীকে পান। তাঁর কাছে কাজ করতে আসা ওঁরাও (ধাঙ্গর) এবং মুণ্ডাভাষী (কোল) শ্রমিকরা দু’জন বিরহড়কে এনেছিলেন এবং পরিচয় দিয়েছিলেন ‘Monkey People’ অর্থাৎ ‘Bandarlok’ বলে। ঐ সময়ে ঐ স্থানে থাকা অন্যান্য আদিবাসীরা দল বেঁধে ঐ দু’জন বিরহড়কে দেখতে আসতো। তাঁদেরকে দেখতে অনেকটা বড় আকৃতির বানর বলে Paddington এর মনে হয়েছিল।

Paddington – এর বর্ননায় ঐ দু’জন বিরহড়ের চেহারা ছিল দীর্ঘে ছোট আকৃতির, নাকটি চ্যাপ্টা, মুখে এবং গালে অসংখ্য চামড়ার ভাঁজ, হাত দুটি অস্বাভাবিক ভাবে বড়, সারা গায়ে গাঁঢ় কালো রঙের চামড়ার উপর লালচে রঙের লোম। অন্ধকারের কোন গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁদের ওরাং ওটাং বলে ভ্রম হবে। মহিলাটিকে একইরকম ভাবে দেখতে। ওঁরাও বা ধাঙ্গরদের তুলনায় চেহারায় তাঁরা এতটায় পৃথক যে তাঁদের পৃথক কোন প্রজাতি বলে ভাবা অসম্ভব ছিলনা। এই আদিম বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষ দুইটি নিজস্ব ভাষায় কথা বলত, যদিও ওঁরাও বা ধাঙ্গররা তাঁদের ভাষা বুঝতে অসমর্থ ছিল। Paddington অনেক পরিশ্রম করে বার করেন যে এই বিরহড়রা সেই সময়ে পালামৌয়ের দক্ষিণ দিকে গভীর জঙ্গলে বাস করছিল। তিনি আরও খোঁজ করে দেখেন যে ঐ সময়ে তাঁরা পালামৌ

জেলার চাঁদোয়া ও বেলুরমঠ অঞ্চলে এবং হাজারীবাগ, রাঁচি জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জঙ্গলে এবং দক্ষিণ সিংভূম জেলার জঙ্গলে তাঁদের অস্তিত্ব ছিল।

১৮৬৮ সালে Captian Deprec যখন ছোটনাগপুর অঞ্চলে ভূ-সংস্থানগত সমীক্ষা করেছিলেন তখন লক্ষ্য করেন যে কিছু বিরহড় মানুষ ছোটনাগপুর জঙ্গল ছেড়ে আসামের চা বাগানে কাজ পাবার আসায় স্বপরিবারে স্থায়ী ভাবে চলে গেছে। ১৮৭২ সালে L.R. Forbes (I.C.S) ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের পালামৌ মহকুমাই Settlement Officer এবং অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার হিসাবে কার্যরত থাকা কালে বিরহড়দের সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন। Forbes-এর কথায় বিরহড়রা আসলেই মুণ্ডা গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসী মুণ্ডারি এবং সাঁওতালী এই দুইটি ভাষা মিশ্রণে বিরহড়দের নিজস্ব ভাষা তৈরি হয়েছে, যদিও তাঁরা উল্লিখিত দুইটি ভাষা থেকে পৃথক। ছোটনাগপুর মালভূমির অন্যতম আদিম আদিবাসী বিরহড়রা যদিও পালামৌ এবং হাজারীবাগ জঙ্গলে এদেরকে বিক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়। প্রকৃতগত ভাবে বন্য স্বভাবের হলেও এরা ক্ষতিকারক নয় বা কারোর পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। উচ্চ পাহাড়ে এবং পাহাড়ের শিরাগুলিতে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে এরা বসবাস করে। চাষবাস তাঁরা জানত না, এরা লাঙলে হাত দেয়না এবং কেও লাঙ্গল স্পর্শ করলে নিজেদের থেকে গোষ্ঠীচূত করেন। বাণিজ্য সম্পদ যেমন গাছের ডাল, শাকপাতা, ফলমূল, পাখি এবং বানরের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকতেন, এরা অনেকেই বানর ধরে পোষ মানায় এবং বানরকে নাচতে শেখায়, এরা বিভিন্ন পরবে কোল আদিবাসীদের ন্যায় বাঁশি, বানাম, ঢোলগ ও ধামসা-মাদল বাজায়। এদের গায়ের রং অত্যন্ত কালো, বেঁটে চেহারা, পুরুষ এবং মহিলাদের মাথায় বড় চুল যা প্রায়শ মুখকে ঢেকে রাখে অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের কারনে এরা অন্য কোন মানুষকে দেখলে সেই স্থান ত্যাগ করে, যেন ভয়াত্ব হরিণ। জঙ্গলে তাঁদের পছন্দের খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা অন্য জঙ্গলে যায় না। সাধারণত তিন-চারটি পরিবার একত্রে একটি পাহাড় বা শৈলশিরাতে বসবাস করেন। বাঁশ এবং জঙ্গলের গাছের পাতা দিয়ে তৈরি ছাউনি ঘরে এরা বসবাস করেন, এই ছোট কুঁড়ে ঘরগুলিতে মাত্র একজোড়া দম্পত্তি বসবাস করে, সাথে বড় ছেলে মেয়েগুলি নিকট অন্য

কুঁড়ে ঘরে থাকে। ছেলে এবং মেয়েরা বিয়ের আগে একটি ঘরে থাকে এবং সমস্ত স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে বিয়ের ব্যাপারে সংযত অর্থাৎ বিরহড় ছাড়া অন্য গোষ্ঠীকে বিয়ে করে না। যখন একজোড়া ছেলে মেয়ে বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত নেয় তখন উভয় পরিবারের বড়রা তাঁদের সমস্ত খাবার একত্রিত করে আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। ঘরে ঢোকার দিক সবসময় পূর্ব দিক থাকে, এছাড়াও ছাউনি এতটা বড় থাকে যে ঘরের মধ্যে জল পরেনা ঘরগুলি মাটি থেকে দুই ফুট উচ্চতা, এবং ঘরগুলি মোটামটি ছয় বর্গফুট আয়তনের হয়। খেঁজুর পাতার চাটাইতে এরা ঘুমায়। এদের বাড়িগুলিকে বলে 'টাণ্ডা' এবং গ্রামগুলিকে বলে 'জাঘি'।

Forbes-এর রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে বিরহড়দের জীবিকা হিসাবে জঙ্গল থেকে বন শূকর, খরগোস, বনমোরগ, পাখি, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি শিকার করতো। জঙ্গল থেকে শক্ত লতা সংগ্রহ করে পাকদিয়ে শক্ত দড়ি তৈরি করতো। জঙ্গল থেকে মধু ও মম সংগ্রহ করতো কাঁধে ভার বইবার জন্য বড় লাঠি, শিকা তৈরি করতো এবং এই ভাবে এরা জীবনযাপন করতো। পুরুষ এবং মহিলারা বিশেষত মহিলারা সুন্দরভাবে জামাকাপড় পরে এবং বুক, হাত এবং হাঁটুতে ট্যাটু করতো, মুখে কখনই ট্যাটু করেনা।

বিরহড়দের পরিবারে কোন সদস্য মারা গেলে মৃত দেহকে এরা পুড়ায়। এরা অশৌচ পালন করে, এরা ১০ দিন এই সময় কেও চুলদারি কাটে না। অশৌচ শেষ হলে এরা ছোট অনুষ্ঠান করে প্রতিবেশী সকলে খাওয়া দাওয়া করে। এরা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় দেবদেবীর পূজা করে এদের মতে দেবতাদের তুলনায় দেবী এবং তাঁর কন্যাদের স্থান অনেক উপরে।

৫.২ বিরহড়দের আদি বাসস্থান(Native Abode of the Birhors):

ছোটনাগপুর মালভূমির পাহাড় এবং জঙ্গল ঘেরা উচ্চস্থান গুলিতে বিরহড়দের আদিবাসস্থান বলে জানা গেছে, এরা যদিও মূলত আধা যাযাবর প্রকৃতির কিন্তু এদের মধ্যে কোন কোন দল অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠী ও সর্বসাধারনের কাছাকাছি থাকার ফলে যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে আধুনিক মানুষদের ন্যায় চাষবাসে সমসংযোগ করেছে। জঙ্গলে বসবাসকারী বিরহড়রা অত্যন্ত দরিদ্র। জঙ্গলের পাতা, গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়ে তাঁদের কুঁড়েঘর গুলি তৈরি করত। এদের ঘরগুলি লম্বা ৮-১০ ফুট, চওড়া ৬ ফুট এবং উচ্চতা ৬ ফুট, দরজার উচ্চতা ২ ফুট প্রস্থে ১.৫ ফুট, ঘরগুলি প্রায় গোলাকারে তৈরি হয় এবং দরজা বৃত্তের ভেতরে দিকে থাকে। এর রূপ গোলাকারে থাকা অনেক গুলি ঘরে কেন্দ্রিও স্থানটি উপযুক্ত বা খোলা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। জঙ্গল থেকে এরা দড়ি তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরণের লতা, মধু, রেশম ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। কাঠের তৈরি পাত্রে এরা বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখে। এদের প্রধান বাসস্থান দামোদর নদীর উত্তর দিকের হাজারীবাগ জেলার উত্তর দিকের মালভূমির জঙ্গলে। এদের মধ্যে কিছু জন পূর্ব দিকে মানভূম জেলার এবং পশ্চিম দিকে সিংভূম জেলার দক্ষিণে ছড়িয়ে রয়েছে। আর কিছু কিছু বিরহড় গোষ্ঠী উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমে রাঁচি জেলায় এবং পালামৌ জেলার পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে রয়েছে ।

৫.৩ বিরহড়দের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Birhors):

একত্রে কয়েকটি পরিবার নিয়ে বিরহড়দের যে জনপথ তৈরি হয় তাকে ‘টাণ্ডা’ (Tanda) বলে। প্রতিটি টাণ্ডার একটি করে প্রধান বা মাঝি থাকে, টাণ্ডার পরিবারগুলি তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান হিসাবে নির্বাচন করেন। বিরহড়রা তাঁদের এই নির্বাচিত প্রধানকে বলে ‘ন্যায়া’বা ‘ন্যায়কে’ (Naya or nayke)। ন্যায়া বা টাণ্ডার প্রধান টাণ্ডার সকল ধর্ম কর্মের পুরুহিতের ভূমিকা গ্রহন করে, যদিও

বিরহড়রা মনে করেন যে তাঁদের প্রধান একজন ধর্ম নিরপেক্ষ নেতা। বিরহড় আদিবাসী মানুষরা গভীর জঙ্গলে শিকারের উপর জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। যদিও শিকার তাঁদের প্রধান জীবিকা তবুও তাঁদের জীবিকার পরিবর্তনের কারণে তাঁদেরকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। (১) যাযাবর (Uthlus or Bhuliyas) (২) স্থায়ী বাসিন্দা (Jaghis or Thanias) । বর্ষাকাল ছাড়া বছরের বাকি সময় গুলিতে যাযাবর প্রকৃতির বিরহড়রা ছোট ছোট দলে তাঁদের পরিবার, অল্প জিনিসপত্র ইত্যাদিকে ঝুড়িতে চাপিয়ে নিয়ে খাবারের সন্ধানে এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। এরা জাল দিয়ে এবং ছোট কুঠার দিয়ে শিকার করেন তাই ঝুড়িতে থাকে শিকার ধরার জাল এবং কুঠার। পুরুষ এবং মহিলা উভয় তাঁদের ঝুড়িতে শুকনো মহুয়া ফুল, বিভিন্ন শস্যদানা ইত্যাদি বহন করে। মেয়েরা মাটির হাড়ি (রান্নার কাজে ব্যবহৃত) এবং মাটির কলশি (জল আনতে এবং সঞ্চয় করে রাখতে) বহন করে। কেবলমাত্র বর্ষার সময় (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস) তারা একটি স্থানে টাণ্ডাতে থাকতে বাধ্য হয়। বাকি সারাবছর তাঁরা এক একটি স্থানে এক থেকে দুই সপ্তাহ বসবাস করে নিকটবর্তী জঙ্গলে শিকার করে এবং উদ্ভিদ জাতিও খাদ্য সংগ্রহ করে।

স্থায়ী বাসিন্দারা এই ভাবে ঘুরে বেড়াতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করেন তাই তাঁরা উচ্চপাহাড়ে অথবা গভীর জঙ্গলে অথবা পাহাড় শিরায় স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করেন। এই ধরনের বিরহড়রা জঙ্গলের কোন একটি স্থানকে বা পাহাড়ে কোন সমতল ভূমিকে পরিষ্কার করে চাষযোগ্য জমিতে রুপান্তর করে চাষাবাদ করেন। তবে এদের বেশির ভাগই জমি থাকে না, তাই পশু শিকার, মধু সংগ্রহ, মৌচাকের মোম সংগ্রহ, উদ্ভিদজ খাবার সংগ্রহ, জঙ্গলে লতা থেকে দড়ি তৈরি ও বিক্রি করে ইত্যাদি উপর জীবন এবং জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। স্থানীয় ভূ-স্বামী, জমিদারের খারাপ ব্যবহার বা অত্যাচার, নিকট গ্রামের অন্যান্য আদিবাসী এবং অ-আদিবাসীদের সঙ্গে বিবাদ এমনকি নিকটে জঙ্গলে প্রয়োজনীয় খাবারের অভাব, দড়ি তৈরির লতার অভাব হলে এরা বসতি ত্যাগ করে অন্যত্রে দূরের কোন জঙ্গলে চলে যায়। স্থায়ী বসতি কোন কোন বিরহড় পরিবার তাঁদের কুঁড়ে ঘড়ে মাটির দেওয়াল দিয়ে থাকে এমনকি

একটি ভিন্ন কুঁড়েতে ছাগল, মোরগ ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা এদেরই কোন কোন দলের মধ্যে একটি পৃথক ছোট কুঁড়েঘর থাকে একে বলে ‘চুকুম্বা’ (Chu’kumba) এটি আত্মার কুঁড়েঘর ‘বোঙ্গা-কুম্ভা’ (Bonga-Kumba) নামে পরিচিত। প্রতিটি স্থায়ী বিরহড়দের ‘বনাঞ্চলের একটি পবিত্র স্থান’ (Secreat Groves) বা বিরহড়দের ভাষায় ‘Jaher’ বা জাহের বা জিলু জাহের থাকে যেখানে কিছু গাছ ও পাহাড়ের খণ্ড থাকে। এই স্থানে ‘সিন্দ্রা বোঙ্গা’ (Sendra Bongas) বা Spirit বা আত্মা বাস করেন। বিরহড়রা শিকারে যাবার পূর্বে এখানে তাঁদের শিকার জাল এবং শিকারের অস্ত্র রাখে এবং দেবতার উদ্দেশ্যে মোরগ উৎসর্গ করেন।

৫.৪ বিরহড়দের প্রাত্যহিক জীবন (Daily Life of the Birhors):

ভোরে মোরগ ডাকার সাথে সাথে বিরহড় পুরুষরা বিছানা ছেড়ে বাইরে আসে, জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা গাছের ছাল (Bohunia Seandens) এবং ‘চিহরলতা’ ইত্যাদি দিয়ে জলে ভিজিয়ে পাকদিয়ে দড়ি তৈরি করে। ‘ছুটিলি’ নামক এক প্রকার লাঠি দিয়ে দড়িতে পাকদেয় এবং দড়িকে শক্ত করে। মহিলারা কিছুক্ষণ পরে সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে ওঠে আসে এবং পুরুষদের দড়ি তৈরিতে সহযোগিতা করেন। এরপর পুরুষরা ঐ দড়ি দিয়ে জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখার জিনিস, শিকার করার দড়ি এবং গরু, মোষ, ছাগল ইত্যাদি বাঁধার জন্য বিশেষ ধরনের দড়ি তৈরি করেন। সকালে সকলে মিলে সেদ্ধ ভাত, পান্তা ভাত অথবা মহুয়া ফুল সেদ্ধ করে খায়। সকালে খাবারের পর পুরুষরা জঙ্গলে যায় শুকনো কাঠ, জ্বালানি কাঠ, এবং দড়ি তৈরির জন্য গাছের ছাল ও লতা আনতে। শুকনো কাঠগুলিকে বাজারে বিক্রি করেন। মহিলারাও জঙ্গলে যায় মহুয়া ফুল, শাকপাতা, কন্দ, ফলমূল ইত্যাদি সংগ্রহ করতে। যেদিন পুরুষ শিকারে ব্যর্থ হয় বা মহিলা দড়ি তৈরি ও বিক্রি করে খাবার আনতে পারেন না সে দিন জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা কন্দ বা মহুয়া ফুল সেদ্ধ করে খায়। বিরহড়রা সামান্য কিছু হাতের কাজ করতে পারেন যেমন- কাঠ দিয়ে তৈরি বাসন, দড়ি দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র ইত্যাদি। বেঁচে থাকার জন্য ঐগুলিকে বিক্রি করে এরা লোহার যন্ত্র পাতি, টিনের গয়না, কুঠার, মাটির হাড়ি, কলসি, লবন ইত্যাদি

সংগ্রহ করে। অল্পক্ষেত্রে বর্ষাকালে বিরহড় মহিলারা পাশাপাশি গ্রামের জমিতে অন্যান্য আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে কাজ করেন।

৫.৫ বিরহড়দের সংস্কৃতি (The Culture of Birhors):

সাঁওতাল, মুণ্ডা এবং বিরহড়রা একিই আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার কারণে তাঁদের সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায় একি হয়। সব আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় এরাও যে কোন উৎসব, অনুষ্ঠানে পানভোজন এবং নাচ-গানে তাঁদের ঐতিহ্য উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে পুরুষরা ধামসা, মাদল ও বাঁশি বাঁজায় এবং মেয়েরা তালে তালে নাচতে নাচতে গান গাইতে থাকে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নাচ-গান এবং পানভোজন মেতে ওঠে। চরম দারিদ্র্যের কারণে সাঁওতাল এবং মুণ্ডাদের মত এদের খুব বেশি অনুষ্ঠান থাকে না। তবে অল্প যে কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠান হয় তাতে প্রতিটি টাণ্ডার বা গ্রামের সমস্থ বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষরা শতস্ফূর্ত ভাবে আনন্দে যোগ দেয়। উৎসব অনুষ্ঠান বিরহড়দের চুরান্ত দারিদ্র্য জনিত জীবন যন্ত্রণাকে সাময়িক ভাবে হলেও লুঘু করে।

পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসীদের নিজস্ব উৎসব অনুষ্ঠানগুলি হল সহরায়, বাহা, কারাম, সস বোঙ্গা পরব, পাতা, ছাতা, সেন্দ্রা, দাঁশায়, প্রভৃতি। বর্তমানে হিন্দুদের উৎসব অনুষ্ঠানে দুর্গাপূজা, কালিপুজা, চণ্ডী পূজা, শীতলা পূজা, মনসা পূজা ইত্যাদি পুজাতে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেন।

বিরহড় আদিবাসী সমাজে বিবাহ হল সংস্কৃতির একটি অংশ। বিয়ে করার পর একজন পুরুষ এবং মহিলা বিরহড় সমাজে পুর্নাঙ্গ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। সাধারণত কোন স্থানে স্থায়ী ভাবে বাসকারী (জাঘি) বিরহড়রা ১১-১২ বছর বয়সে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬-১৭ বছর বয়সে বিয়ে দিতে পারেন কিন্তু সাধারণত যুবক যুবতী মেয়েদের মধ্যে দেওয়াটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রীতি। এ ক্ষেত্রে ১৬-১৭ বছরে মেয়ের সঙ্গে ২০-২১ বছর বয়সের একটি ছেলের বিয়ে দেওয়া হয় বিয়েতে ছেলে এবং মেয়ের পরিবারের প্রধানরা বিয়ের ব্যাপারে সব রকমের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অসবর্ণ বিয়ে কিংবা একি

গোত্রের মধ্যে বিবাহ যোগ্য ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিয়ে হয় না। যদি এক গোত্রের মধ্যে কেউ বিয়ে করে বা অসবর্ণ বিয়ে করে তবে সেই বিয়ে ব্যভিচার বলে স্বীকার করা হয় এবং ঐ রূপ স্বামী স্ত্রীকে বিরহড় সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। বিরহড়দের মধ্যে দশ রকমের বিবাহ পদ্ধতি চালু রয়েছে। বিরহড়রা তাঁদের বিবাহকে বলে 'বাপলা' অর্থাৎ বিবাহ। পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ রকমের বিবাহ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল- সদর বাপলা, বোলো বাপলা, অপরতাপ্পি বাপলা, উরাউরি বাপলা এবং গুলামি খেটে বাপলা।

বিরহড় আদিবাসী সমাজের মানুষ প্রকৃতিকে বিশ্বাস করেন এবং পূজা করেন। মারাং বুরু, জাহের আয়োঃ, সিং বোঙ্গা, চাঁদ বোঙ্গা, হারাম-হাপ্রাম প্রভৃতি ঈশ্বর এবং পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস করেন। বিরহড়দের ঈশ্বর বা ভগবান গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিরহড়দের রক্ষা করে এবং এর জন্য পবিত্র আত্মার নির্দিষ্ট স্থানে তাঁদের উদ্দেশ্যে খাদ্য এবং পানীয় উৎসর্গ করতে হয়। পবিত্র আত্মার এই নির্দিষ্ট স্থানটির নাম জাহের থান বা স্থান, এখানে খাদ্য এবং পানীয় উৎসর্গ করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন

(Indigenous Knowledge and Sustainable Development)

৬.১ আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান (Indigenous Knowledge):

Indigenous Knowledge (IK) – কে নিয়ে বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সমূহে চর্চা চলছে, এবং উত্তরোত্তর এর চর্চাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ হিসাবে মনে করা হয় বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্বব্যাংকের অন্যতম কর্মকর্তাগ আদিবাসী সমাজ ও জঙ্গল মহলে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে উপস্থিত এই জ্ঞানের চর্চার উপরে গুরত্ব দিচ্ছেন। আদিবাসী সমাজের মানুষ জঙ্গল ও জঙ্গল লাগোয়া এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার রক্ষণাবেক্ষণ, নিজেদের প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ঠ জ্ঞানী। এই জ্ঞান সবসময় তাত্ত্বিক নয়, বরঞ্চ এটি অনেক বেশি প্রায়োগিক। অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তাগণ লক্ষ্য করেছেন যে জঙ্গলে বা জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা বংশ পরম্পরাগত ভাবে পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাটি সমূহের যে জ্ঞান আহরণ এবং সুরক্ষিত রেখেছেন তাতে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করেও এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজেদের প্রাত্যহিক চাহিদাকে পুরণ করছেন।

সামাজিক নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে ‘Indigenous People’ বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের তাঁদের জীবন ধারণের জন্য চিরাচরিত জ্ঞান বিষয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ‘Indigenous Knowledge’ বলতে বুঝিয়েছেন, “Local and Indigenous Knowledge refers to the understanding of skills and philosophies develop by societies with long histories of interaction with their natural surroundings”.

Gadgil, Beaker and Folke (1993) 'Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation' নামক তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধে বলেছেন যে 'Indigenous People' বা কোন রাষ্ট্রের আদিম আদিবাসীরা পরিবেশকে সুরক্ষিত রেখে প্রাচীন কাল থেকে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে এবং পরবর্তীতে পূর্ণ ব্যবহার যোগ্য হিসাবে সেগুলি সুরক্ষিত থাকছে। তাঁদের এই জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মকে প্রাকৃতিক সম্পদকে সুরক্ষিত করে রাখতে সহায়তা করছে।

কোন কোন গবেষক Indigenous Knowledge বা দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান শব্দটি ব্যবহার না করে পরিবর্তে 'Folk Knowledge' বা 'লোক জ্ঞান' ও 'Traditional Knowledge' বা 'চিরাচরিত জ্ঞান' শব্দগুলি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন।

Brian Morris (2010) 'Folk Knowledge' শব্দের প্রয়োগে অধিক সক্রিয় ভুমিকা নিয়েছেন। তাঁর মতে Folk Knowledge, "Simply means the knowledge that ordinary people have of their local environment: environs meaning what is around us".

Morris (2010) –এর মতে লোকজ জ্ঞান হল-

১) অবশ্যই একটি স্থানীয় / দেশীয় জ্ঞান যা একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় থেকে প্রাপ্ত।

২) লোকজজ্ঞান কখনও কখনও লিঙ্গ ভিত্তিক অথবা কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যা একজনের কাছ থেকে অন্য জনের কাছে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

৩) লোকজজ্ঞান জনগণের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এবং প্রায়োগিক জ্ঞান।

৪) লোকজজ্ঞান হাতে কলমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উঠে এসেছে।

৫) লোকজজ্ঞান অ-প্রথাগত জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মৌখিক ভাবে একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়।

৬) চিরাচরিত জ্ঞানের ন্যায় লোকজজ্ঞান সুস্থিত জ্ঞান নয় বরঞ্চ একটি প্রজন্ম থেকে অন্য আর একটি প্রজন্মে সঞ্চারিত হওয়ার সময়ে এটি পরিবর্তীত হয়।

৭) লোকজজ্ঞান পরিবেশ সংরক্ষণের নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।

The World Intellectual Property Organization (WIPO) 'Indigenous Knowledge' বা 'আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান' শব্দের পরিবর্তে 'Traditional Knowledge' বা 'পরম্পরাগত জ্ঞান' বা 'ঐতিহ্যগত জ্ঞান' শব্দকে প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মতে পরম্পরাগত বা ঐতিহ্যগত জ্ঞান বলতে, "Knowledge, know-how, skill and practices that are develop, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural and spiritual identity". তবে Borthaqar and Sing (2010) বলেছেন যে আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান বা পরম্পরাগত জ্ঞান দুইটি শব্দের যে কোন একটি শব্দকে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং উভয় শব্দের বৈশিষ্ঠ্য একই।

Karen Robarts (1996) এর মতে, "Traditional Knowledge (TK) is holistic and can't be separated from the people…traditional knowledge parallerd scientific knowledge".

তবে পরম্পরাগত জ্ঞান সাধারণ ভাবে অনুশীলন ভিত্তিক জ্ঞান যা মূলত কৃষিকর্ম, মাছ চাষ, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, বাগান চাষ, জঙ্গল বিদ্যা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত।

Convention on Biological Diversity (CBD, 1992) পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে ও স্থিতিশীল উন্নয়নে পরম্পরাগত জ্ঞানের উপর গুরত্ব দিয়েছেন।

Marie Battiste & James Henderson (2000) তাঁদের বই ‘Protecting Indigenous Knowledge and Heritage’ এ বলেছেন যে, আদিবাসী গোষ্ঠীদের দেশীয় জ্ঞানের সংজ্ঞাদানের ক্ষেত্রে “No short answer exists”. কারণ তাঁরা মনে করেন এই সংজ্ঞাগুলি উপর থেকে আরোপিত, দেশীয় আদিবাসীরা এই সংজ্ঞাকে গ্রহন করুক বা না করুক। তাঁরা আরও বলেছেন যে জ্ঞান কখনই একক ভাবে উঠে আসে না। একটি জ্ঞান অপর জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং মানুষের পরম্পরাগত জ্ঞান থেকে কখনই পৃথকীকৃত নয়। তাই তাঁরা বলেছেন, “Knowledge is the expression of the vibrant relationship between people of the ecosystem, and the living being and sprits they share their lands”. সুতরাং দেশীয় জ্ঞান কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান নয় বরঞ্চ এটি সৃষ্টি, পরিবেশ, প্রাকৃতিক জগতের সম্মিলিত রূপ। যে সমস্ত দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন এই জ্ঞান সমূহকে ব্যবহার করে তাদের থেকে এই জ্ঞানকে কোন ভাবেই পৃথক করা যায় না।

Brian Morris (2010) বলেছেন যে বহু গবেষক Indigenous Knowledge বা Traditional Ecological Knowledge শব্দগুলি ব্যবহার না করে এই বিষয়টিকে বোঝবার জন্য পৃথক শব্দের অবতারণা করেছেন- ‘Folk Knowledge’, ‘Folk Biology’, Ethno ecology’, ‘Ethnobotany’, ‘Local Knowledge’, ‘Traditional Environmental Knowledge’ etc. সুতরাং Indigenous Knowledge জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে এবং বিশ্বে সমস্ত জীবের খাদ্য সুরক্ষার সুনিশ্চিত করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে (UNEP-WCMC, 2021)।UNEP (1999) জীব-বৈচিত্র্যের সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সংরক্ষণে এবং সমগ্র বিশ্বের জীব- বৈচিত্র্যের সংরক্ষণের উপর যথেষ্ট গুরত্ব দিয়েছেন। তাই জীব এবং তার সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে পারলে জীব-বৈচিত্র্যের ধ্বংস সাধন থেকে জীব-বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে। এর জন্য দেশীয় ভাষা সমূহকে সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। দেশীয় ভাষা হারিয়ে গেলে নির্দিষ্ট দেশীয় ভাষাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারেরও অবক্ষয় ঘটবে। তাই বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র জীব-বৈচিত্র্যের মূল্য বোধকে

তাঁদের policy-এর মধ্যে সমন্বিত করছেন। আর এই কারনে National Education Policy (2020) 'Indigenous Knowledge' বা 'দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞানকে' শিক্ষা ও গবেষণার সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করার কথা বলেছেন। এর জন্য সমস্ত ধরনের জাতি ভিত্তিক বিভেদের প্রাচীরকে ধ্বংস করতে হবে। ভারত সরকারের পক্ষে MHRD তাই দেশীয় জ্ঞান এর উপর গবেষণা এবং আলোচনা বিষয়ে গুরত্ব দিয়েছেন, যা Indian Knowledge System –এর একটি অংশ।

কোন একটি রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষের মধ্যে দেশজ জ্ঞানের উপস্থিতি, দেশজ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দেশজ জ্ঞান ও সংস্কৃতির নিরন্তর চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান থেকে জানা যায় মানুষ কি ভাবে তার পরিবেশ, প্রাণীজ সম্পদ, উদ্ভিজ্জ সম্পদ, মৃত্তিকা, জল এবং বায়ুর সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কে আবদ্ধ। খুব প্রাচীন কাল থেকেই আদিবাসী মানুষরা বুঝেছিলেন যে আমাদের প্রকৃতি এবং তার অধীন উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যকে সুরক্ষাদান বা সুরক্ষিত করতে না পারলে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটবে। তার ফলে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে প্রাচীনকাল থেকে মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞানের নিরন্তর চর্চা থেকে বোঝা যায় দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান কিভাবে যুগে যুগে মানুষকে সহায়তা করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই জ্ঞানের পর্যালোচনা জরুরী ভিত্তিকভাবে হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী কোন নির্দিষ্ট এলাকার বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষের সম্বন্ধে যেমন- অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তেমনি এই ফসল কী ভাবে দেশীয় উপায় অবলম্বন করে সুরক্ষিত রাখা যাবে সেই বিষয়েও তারা যথেষ্ট তৎপর। প্রাচীন দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান থেকেও পরম্পরাগত ভাবে আদিবাসী মানুষরা জেনে এসেছেন কোন কোন গাছের ওষধি গুণ রয়েছে, কোন কোন গাছের কোন অংশে ওষধি গুন রয়েছে ; এবং কোন রোগের চিকিৎসায় এই গাছ/ গাছের বিশেষ কোন অংশকে ব্যবহার করা যাবে। আবার একই ভাবে ওষধি বৃক্ষের জন্মানোর ধারাবাহিকতাকে কিভাবে রক্ষা করা

যায়, কিভাবে ওষধি গাছগুলিকে সুরক্ষিত রাখা যায় এই বিষয়ে দেশজ জ্ঞানের চর্চা নতুনভাবে আলোকপাত করে।

মূল গবেষণা সন্দর্ভে কিছু ভেষজ জ্ঞান ভিত্তিক উদ্ভিদ, প্রাণী, ওষধি গাছ, খাদ্যযোগ্য মাশরুম, পোকামাকড় এবং প্রাণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হল-যেগুলি আদিবাসী মানুষরা বংশানুক্রমে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর পরম্পরাগত জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে জেনেছেন।

৬.১.১ বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান (Sacred Grouves of Forest):

একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা, ঐ অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য চেষ্টা করেন। যেকোনো জনগোষ্ঠীতেই বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রকৃতির পূজা করেন এবং অন্যভাবে বললে শ্রদ্ধা সহকারে প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রাখবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টাটি এমনভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে আদিবাসীদের রক্তে প্রবেশ করেছে যে ধারাবাহিকভাবে আদিবাসীরা এই জ্ঞানচর্চাকে পরম্পরা বলে মেনে নিয়েছেন। 'বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান' গুলি তাই প্রকৃতি পূজার স্থান (থান) যেখানে আদিবাসীরা কিছু পবিত্র বৃক্ষকে সুরক্ষিত রাখেন এবং ওইগুলির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ঐ পবিত্র স্থানে যে গাছগুলি রয়েছে কখনোই সেগুলিকে নষ্ট করা হয় না। এই কারণে 'Sacred Grouves' অঞ্চলে কোন মানুষ কখনো প্রবেশ করে না। স্বাভাবিকভাবে বনাঞ্চলের পবিত্র স্থানে যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ রয়েছে তারা মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে বংশবৃদ্ধি ও বংশ রক্ষা করে থাকে। এলাকার আদিবাসী মানুষরা প্রকৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে, আর এর মাধ্যমে আদিবাসীরা প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক উপায়ে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। (Gadgil & Vartak, 1976; Khiewtam & Ramakrishnan, 1989; Chandrashekara & Sankar, 1998; Hughes & Chandrean, 1998; Kanowski, 2000)।

সুতরাং ‘বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান’ হল পরম্পরাগতভাবে সুরক্ষিত নির্দিষ্ট বনাঞ্চল যা প্রাকৃতিক মিউজিয়াম হিসাবে পরিচিত এবং ধর্মীয় প্রথায় যেখানে উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ সম্পদ সমূহ সুরক্ষিত থাকে। বিশ্বাস করা হয় যে হাজার হাজার বছর ধরে বনাঞ্চলের এই স্থানে কখনো কোন মানুষের পা পড়েনি, সুতরাং ঐ পবিত্র বনাঞ্চলটি কুমারী বলেই আদিবাসী সমাজে স্বীকৃত হয়ে আসছে। Gadgil and Vartak (1976) এর মতে প্রাক-বৈদিক যুগেরও বহু পূর্বে আগে থেকেই যখন মানুষ চাষবাস করতে শেখেনি, পশু শিকার এবং ফলমূল খাদ্যের সংস্থান করত, তখনও মানুষ এই পবিত্র বনাঞ্চলে তাদের পায়ের ছাপ রাখেনি। দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান নিয়ে যে সমস্ত বিজ্ঞানী চর্চা করেছেন তাঁরা মনে করেন জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে বনাঞ্চলের পবিত্র স্থানের (থান) গুরুত্ব অপরিসীম (Khan, Menon, & Bawa, 1997; Haridasan, & Raw, 1985; Kosambi, 1962; Gadgil & Vartak, 1976)। কেবল মাত্র ভারতেই এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান রয়েছে (Malhotra, Gokhele, Chatterjee, & Srivastava, 2007)।

দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা তাদের চিরাচরিত ধর্ম বিশ্বাস থেকে ওই নির্দিষ্ট এলাকায় পাহাড়, নদী, জঙ্গল, ঝর্ণা, প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতির জীবন যাপনকে কোনভাবেই বিশৃঙ্খল করতে চাননা। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে কোন ব্যক্তি ওই পবিত্র বনাঞ্চলে প্রবেশ করলে বা গাছ কাটলে বা কোন প্রাণীকে হত্যা করলে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হবে বা কোন চিকিৎসার অযোগ্য রোগে আক্রান্ত হবে। এই ভাবেই প্রাচীন কাল থেকে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা নিজেদের পরম্পরাগত সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, উৎসব ইত্যাদির জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতি এবং সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছেন এবং সুরক্ষিত রাখছেন।

৬.১.২ ওষধি গাছ সমূহ (Medicinal plants):

অধিকাংশ দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষদের মধ্যে ঔষধি গাছ-গাছড়া সমূহ তাদের সামাজিক জীবন এবং রোগের চিকিৎসা ও রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষদের জীবনে ঔষধি গাছগাছড়া এবং রোগ নিরাময়ের মধ্যে একটি ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কোন কোন লোককথায় দেখা যায় যে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা রোগের চিকিৎসায় নির্দিষ্ট ওষধিযুক্ত গাছগাছড়া ব্যবহার করছেন। প্রতিটি রাষ্ট্রে যে সকল আদিবাসীরা রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই ঔষধি বৃক্ষের পরিচিতি এবং ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞানের এক একটি জীবন্ত প্রদর্শন শালা হিসেবে পরিচিত। বিশেষত আদিবাসী মানুষেরা এমনকি ছোট ছোট শিশুরাও কিছু কিছু ঔষধি গাছ চেনে এবং গাছের নির্দিষ্ট অংশের ওষধি মূল্য জানে এবং কোন ধরনের রোগ নিরাময়ে এটিকে কিভাবে ব্যবহার করা যাবে সেই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে। কোন কোন ওষধি যেমন রোগের চিকিৎসায়, পুরুষদের যৌন শক্তিবর্ধক হিসাবে প্রজননের কাজে এবং নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচার ব্যবহারে ব্যবহৃত হয়। তেমনি কিছু কিছু ঔষধি গাছগাছড়া, শিকার কালে, বিবাহ এবং বন্ধুত্ব স্থাপনে সহযোগী হয়। আবার কিছু কিছু ওষধি গাছ ব্যবহার করলে মানুষের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা কোন গাছের শুধুমাত্র শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল, এমনকি গন্ধ শুঁকে বলতে পারেন এটি কি গাছ এবং একে কিভাবে ও কোন কাজে ব্যবহার করা হয়। এখনো পর্যন্ত 'Ethno Botanist' বা 'Pharmacologist' রাও এত সহজে ওষধি গাছ-গাছড়া চিনতে পারেন না। সুতরাং আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষজনের হাতে পরম্পরাগত ভাবে থাকে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান যেটি তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহায়ক।

৬.১.৩ জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় দেশীয় জ্ঞানের ব্যবহার (Use of Indigenous Knowledge in Water Conservation and Management):

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা জানেন কিভাবে জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা করতে হয়। হিমালয় পর্বত অঞ্চলে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা কিভাবে করে থাকেন সেই বিষয়ে গবেষণা করেছেন Namtak & Sharma (2018)। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে আদিবাসী মানুষরা পুকুর কেটে শাখা-প্রশাখা যুক্ত দীর্ঘ খাল কেটে জল সঞ্চয় করেছেন,

বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলেও জল সংরক্ষণের জন্য পুকুর কাটা, পুকুর সংস্কার এবং খালকাটার প্রথা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বনাঞ্চলে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা পুকুর কেটে ও কুঁয়ো কেটে জল সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত রয়েছেন। কোন কোন পরিবার নিজস্ব জমিতে পুকুর কেটে মাছ চাষ করেন। অন্যরা ঐ পুকুরের জল ব্যবহার করতে পারলেও মাছ ধরার অধিকার তাদের থাকে না। এই ধরনের পুকুরের চারিদিকে পাড় বরাবর বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ বসানো থাকে এবং কিছুটা জমিতে সবজির চাষ হয়। এরূপ পুকুর সংশ্লিষ্ট ফল ও সবজি বাগান যেমন পরিবারের নিকট মানুষজনের জন্য স্বাস্থ্যকর, আর্থিক ভাবে লাভজনক, তেমনি সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। যেকোনো গ্রামের পক্ষে এইভাবে জল সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬.২ স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development):

Sustainable Development শব্দটি প্রথম ব্যবহার হয় 'United Nations Conference on Human Development' (1972) দ্বারা। ১৯৭২ সালে শব্দটি প্রথম ব্যবহার হলেও প্রায় ১৫ বছর পরে ১৯৮৭ সালে 'United Nation's World Commission on Environment and Development (WCED) এর সেমিনার রিপোর্ট 'Our Common Future' এর মধ্যে বহুলভাবে ব্যবহার হয়েছে। WCED(1987) 'Brundtland Commission' নামে পরিচিত, কারণ এই কমিশন এর চেয়ারম্যান ছিলেন নরওয়ের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী Gro Brundtland তাঁর নাম অনুসারে Sustainable Development বলতে বোঝায় সেই স্থিতিশীল উন্নয়নকে যার জন্য বর্তমানের সম্পদ সমূহকে চাহিদা অনুযায়ী এমন ভাবে ব্যবহার করা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁদের চাহিদা অনুসারে সম্পদকে ব্যবহার করতে পারেন। 'Development' শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। তবে মোটামটি ভাবে 'Development' বলতে বোঝায়, "Development is a Culturally bounded Philosophically and Politically Combind term. The meaning of 'what is development' is as impacted by how it is define as it's by whom". (Lertzman, & Vredenburg, 2005, p.252)।

Brundtland report অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে যে ভয়ংকর দিকে এগিয়ে চলেছে তার থেকে মুক্তির একমাত্র পথ অর্থনীতি (Economy) এবং পরিবেশ চর্চা (Ecology) এর মধ্যে বিবাহ দান অর্থাৎ একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই রিপোর্টে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের সরকার, রাষ্ট্র প্রধান, এবং তাদের জনগণকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব পরিবেশগত ভাবে অবনমনের মধ্যে রয়েছে। এর থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হবে এবং অর্থনৈতিক নীতি রচনা করতে হবে যাতে পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিবেশের সমস্যা রক্ষায় সকলে সক্রিয় হয়। সুতরাং WCED এর মতে সমগ্র বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে ধাপে ধাপে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে পরিবেশবিদ্যার রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অর্থনীতি ইত্যাদি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারে। তাই পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা জরুরী ভিত্তিকভাবে প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিষয়সমূহ যেমন জীবনধারণের গুণগতমান এবং অর্থনীতির মানদন্ডে বিভিন্ন গোষ্ঠী মানুষের মধ্যে বৈষম্যগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করা যাবে না বরঞ্চ সমগ্র বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষাপটে সমস্যাগুলিকে বিচার করতে হবে আর এর সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে থাকবে আন্তর্জাতিক স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আগ্রহ।

WCED এর রিপোর্টে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে যে সমগ্র বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি যেন সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং ব্যবসায়ীরা উপযুক্ত পদক্ষেপ সমূহ দ্রুত গ্রহণ করেন। কমিশনের মতে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র সমস্যার অংশীদার না হয়ে যেন সমাধানের অংশ হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে কোন কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মধারনা এই পরিবেশ সমস্যার কাজে যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছেন তারও পর্যালোচনা জরুরি।

WCED (1987) এর ভাবনাকে আরও বিস্তীর্ণ করতে ১৯৯২ সালে 'United Nations' সংঘটিত করেন 'Recode Janiro Conference on Environment and Development', এবং 1998 সালে 'Kyto Conference 'United National Framework Convention on Climate Change'।

মানব সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি হলো পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের প্রয়োজনে কিছু 'Quality of Life Asset' কে রেখে যাওয়া যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সমূহ চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হয়। সুতরাং sustainable development এর কেন্দ্রীয় নীতিটি হল 'Inter-Generational Equity' (Turner, Doctor, & Adger, 1994) কে সুরক্ষিত রাখা। WCED (১৯৮৭) ও প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি

করেছেন। তাঁদের মতে যত দিন যাবে ততই শিল্পায়ন সমগ্র বিশ্বে বৃদ্ধি পাবে। এর পথ ধরে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হবে। সবুজ বনাঞ্চল দূষিত হবে, পুকুর, খাল, বিল, নদী এবং সমুদ্রের জল হয়ে উঠবে জীবজগতের পক্ষে বিষাক্ত, নষ্ট হবে বাতাস তথা পরিবেশ। এর পেছনে মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিল্পায়ন ঘঠিত উন্নয়নের ঊর্ধ্বমুখী লেখচিত্র। পর্বত প্রমাণ মানুষের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে তাই ধ্বংস হয়ে চলেছে বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী, বাতাস, পরিবেশ, এমনকি আদিবাসী জনগোষ্ঠী। পৃথিবীর সকল দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে তাই প্রকৃতির ধ্বংস মানে আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নের সামনে দাঁড় করানো। তারপর প্রাকৃতিক সম্পদকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের জন্য একই সঙ্গে সুরক্ষিত রেখে যাওয়া যায়। এতে করে আদিবাসী সমাজ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা, কারণ আদিবাসী সমাজ জানে কিভাবে Natural Capital (Ecological Economics) এর ধারণা কে ব্যবহার করে 'Natural Income' কে সংরক্ষিত রাখা যায়। এই 'Natural Capital' হলো সমস্ত ধরনের জৈব পদার্থ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের সমাহার (Daly, H., 1994) । সুতরাং মানুষের তৈরি সম্পদ এবং প্রকৃতির দেওয়া সম্পদকে একক গোষ্ঠীবদ্ধ কিছু মানুষ বা বিশেষ কোন কোন রাষ্ট্র একাকী সবটুকু ভোগ করবেন না; সমস্ত সম্পদকে, সমস্ত মানুষ এবং জীবজগতের জন্য সমানভাবে ব্যবহার করতে দিতে হবে। কবির কথায় -

এই জগতের যাহা সম্বল,
বাসে ভরা ফুল রসে ভরা ফল,
সুস্নিগ্ধ মাটি সুধা সমজল পাখির কন্ঠে গান, সকলের এতে সম অধিকার,
এই তার ফরমান। ভগবান! ভগবান!

(কাজী নজরুল ইসলাম)।

Turner এবং অন্যান্যদের (1994) মতে স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) এর মূল উপজীব্য হল প্রকৃতির সম্পদকে সুরক্ষিত রেখে একটি প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া। সুতরাং স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) হল-

"Sustainable Development is positive socioeconomic change that does not undermine the ecological and social systems upon which communities and society are dependent. Its successful implementation requires integrated policy, planning, and social learning process; its political viability depends on the full support of the people, it affects through their government, their social institutions, and their private activities" (Rees,

1989, p.3)।
সুতরাং যে কোন আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের সুস্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখতে হলে পরিবেশ, সমাজ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে যাতে সমস্ত মানুষের মধ্যে সাম্য সুরক্ষিত থাকে। সুতরাং স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) এর একটি অংশ হল 'Social Capital'।

Berkes and Folkes (1994) স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) বিষয়ে বলতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন 'Cultural Capital' এর ধারণাকে। তাঁদের মতে পরিবেশ এবং অর্থনীতি যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তেমনি পরিবেশ এবং অর্থনীতি নির্ভরশীল সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গেও।

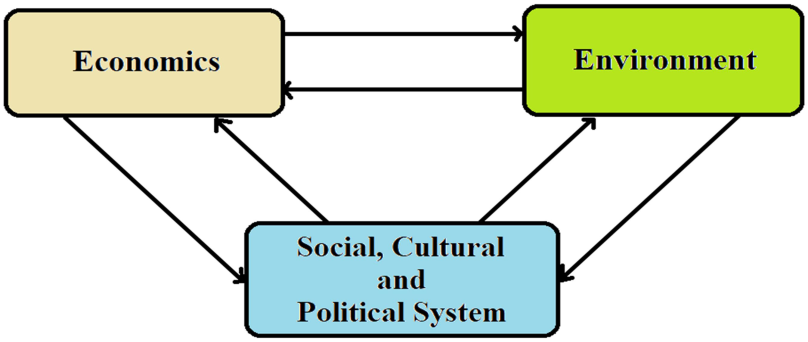

Cultural Capital

Lertzman (১৯৯৯) দেখিয়েছেন যে সাংস্কৃতিক বলতে জ্ঞান, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ রূপ সম্পদ সমূহ যার উপরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির ভিত্তি নির্ভর করে। যে বাস্তুতন্ত্রের উপর জগৎ নির্ভরশীল তাকে সুরক্ষিত রাখলে বৃদ্ধি সীমিত থাকলেও কিন্তু বিকাশ বা Development সীমিত হয়ে যাবে না। সুতরাং বিকাশ বা Development হল Sustainable এর সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু Growth বা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

৬.৩ স্থিতিশীল উন্নয়নের নৈতিকতা (Morality of Sustainable Development):

প্রতিটি সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধ তথা নৈতিকতা রয়েছে। ঐ মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার দিকগুলি তাদের সংস্কৃতির পক্ষে অবশ্যই অর্থপূর্ণ, সুতরাং প্রতিটি সংস্কৃতিরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে স্থিতিশীল উন্নয়নের (Sustainable Development) প্রেক্ষাপটে। এটি নিশ্চিত যে দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের জমি, জীবিকা, জীবন উন্নয়নের নাম করে নষ্ট করা যাবে না। উন্নয়নের নামে জমি, জীবিকা এবং জীবনের কোন ধরনের ক্ষতি আদিবাসী গোষ্ঠীর সমাজের পক্ষে অভিপ্রেত নয়। আদিবাসী সমাজ যেহেতু পরম্পরাগত (TEK) ভাবে পরিবেশগত জ্ঞানকে চর্চা করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ঐ জ্ঞান তুলে দেয়, তাই আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন কমিশনে স্বীকার করা হয়েছে যে স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) এর প্রয়োজনে Indigenous Knowledge, এবং Indigenous People কে সুরক্ষিত রাখতে হবে। যেমন Brundtland Commission (1987)-এর মতে, "These communities are the repositories of vast accumulations of traditional knowledge and experience that link humanity with its ancient origins. Their disappearance is a loss for the larger society which could learn a great deal from their traditional skills in sustainably managing very complex ecological systems."

বিভিন্ন কমিশনের শ্বেতপত্রে স্বীকার করা হয়েছে যে স্থিতিশীল বিকাশের (Sustainable Development) ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষজনের ভূমিকাকে খাটো করে দেখা যাবে না (International Convention on Biological Diversity, Agenda 21, Guiding Principles on Forests; and the Reo-declaration on Environment and Development)। দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের পরম্পরাগত জ্ঞান, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনাতে শ্বেতপত্র দাখিল হয়েছে (Battiste & James, 2000)।

দ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদির কারণে একদিকে যেমন আদিবাসীদের জনজীবন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে অন্যদিকে তারা হারিয়ে ফেলছে তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের অধিকার, যেমন ভাষা, বৌদ্ধিক সম্পদ, এবং এর ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে জীব-বৈচিত্র্য পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং জীব-বৈচিত্র্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Nettle & Romaine, 2001)। পৃথিবীর ৬০% ভাষায় কথা বলে মাত্র ৪% মানুষ। এই সমস্ত অধিকাংশ ভাষা এবং ঐ ভাষাভাষী মানুষরা বর্তমানে সভ্যতার

বিকাশ, শিল্পায়ন এবং দ্রুত হারে নগরায়নের ধাক্কায় প্রায় কোনঠাসা হয়ে পড়েছে অর্থাৎ, 'Bio Linguistic Diversity' আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। একটি ভাষার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য শব্দভাণ্ডারের চিরসমাধি। আর এই ভাষা ও তার শব্দভান্ডারের ধ্বংসের সাথে সাথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে মানুষের যোগাযোগ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হচ্ছে। ভাষা মানুষকে তার পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করে। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় শব্দভাণ্ডার, জ্ঞানভান্ডার, পরিবেশের সাথে মানুষের বোঝাপড়ার সম্পর্ক। সুতরাং আদিবাসী মানুষদের ভাষার মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে ঐ বিশেষ ভাষাভাষী মানব গোষ্ঠীর ধ্বংসকেই আসন্ন করে তোলে। আদিম জনগোষ্ঠী তথা দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ, এবং প্রকৃতির থেকে আহরণ করেছে প্রচুর প্রায়োগিক এবং বর্ণনা মূলক জ্ঞান ভান্ডার। উপাত্তের তুলনায় এই তথ্যগুলি দীর্ঘ সময়কাল ধরে সত্য বলে প্রমাণিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালনায় এই জ্ঞান সঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়ে এসেছে। এই ভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের এবং বাস্তুতন্ত্রের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা কোন অংশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনার ব্যবস্থা থেকে কম নয়।

এই সামগ্রিক আলোচনা থেকে আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিল্পের প্রয়োজনে সম্পদকে প্রকৃতির কোল থেকে কেড়ে নিতে গিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষদের এবং তাদের সংস্কৃতিকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি, তা বিশেষভাবে অনৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিপরীতে অবস্থান করে। বরঞ্চ নৈতিকতার বিচারে আমাদেরকে এই সমস্ত মানুষদেরকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে, যাতে তারা তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-আচরণ, প্রথা ইত্যাদিকে সংরক্ষিত করে চলতে পারে। স্থিতিশীল বিকাশের প্রেক্ষাপটে এইটুকু বলা যায় যে বাস্তুতন্ত্র, আদিম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং ভাষা ইত্যাদি একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কিন্তু জটিল সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ। আর আমাদের করতে হবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধাভিত্তিক বাক্য বিনিময় যাতে বিশেষজ্ঞরা প্রবেশ করতে পারেন দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের পরম্পরাগত দেশীয় জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং ভাষার গভীরে। অন্যথায় স্থিতিশীল উন্নয়ন হারাবে নীতিবোধ এবং মূল্যবোধ।

৬.৪ স্থিতিশীল উন্নয়নে বিরহড় আদিবাসীদের ভূমিকা (Roll of Birhor Tribe on Sustainable Development):

৬.৪.১ বিরহড়দের মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি:

পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীদের মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি ভিন্ন ও পরিবেশ বান্ধব। বিরহড় সমাজের কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর মৃতদেহকে একটি নতুন সাদা কাপড়ে জড়িয়ে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। গোরস্থানে মৃতদেহ আকারের তুলনায় একটু বেশি লম্বা এবং চওড়ায় মাটি খোঁড়া হয়। এরপর মৃতদেহকে চারপাশে তিনবার ঘুরিয়ে উত্তরদিকে মাথা করে খোঁড়া গর্তে শুইয়ে দেওয়া হয়। এরপর সকলে মিলে মৃতদেহটিকে মাটি চাপা দেয়। বিরহড়দের মৃতদেহকে সৎকার যে পদ্ধতি তা পরিবেশ সহযোগী অর্থাৎ এই সৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে কোন রকম পরিবেশ দূষণ হয় না। মৃতদেহটি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা মাটির সাথে মিশ্রিত হয়, এর ফলে একদিকে যেমন মাটির উর্বরতাকে বাড়ায় সেইরুপ কোন রকম মাটি এবং বায়ুদূষণ হয় না। কিন্তু অন্যান্য অ-আদিবাসী মানুষজন শ্মশানে মৃতদেহকে পোড়ায়, ফলে পরিবেশে ব্যাপক বায়ু দূষণ এর সাথে সাথে পরিবেশ দূষণ হয়ে থাকে। এই দিক থেকে বলা যেতে পারে বিরহড় আদিবাসীদের পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ যে তাঁরা মৃতদেহকে আগুনে জ্বালানোর পরিবর্তে কবর দেন, যেটি পরিবেশে স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের মৃতদেহ সৎকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

৬.৪.২ আদিবাসীদের সারহুল এবং বাহা উৎসব (Sarhul And Baha Festival):

আদিবাসীদের বিভিন্ন উৎসব ও পরবের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল সারহুল এবং বাহা পরব। এই উৎসব বা পরবটি পালন করে আদিবাসী গোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুণ্ডা, বিরহড়, হো, মাহালি, অসুর, প্রভৃতি গোষ্ঠী বর্গ। বিশেষত এই উৎসবটি পালন করা হয় ফাল্গুন মাসে, যখন শাল বনে শাল গাছে নতুন ফুলের আগমন ঘটে এবং মহুয়া গাছের মহুয়া ফুল দিয়ে গাছতলা ছেয়ে যায়। এছাড়া প্রায় সমস্ত

গাছে নতুন পাতা গজায় এবং শাল ফুলের গন্ধে বন জঙ্গল ভরে ওঠে, তখন যেন মনে হয় যে প্রকৃতি দেবী ফুলের অলঙ্কারে সেজে আবির্ভূত হয়েছেন। এই সময় আদিবাসী গোষ্ঠীর পুরুষ, নারী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এবং শিশুরা আনন্দের সাথে এই উৎসব বা পরবে আদিবাসীদের প্রাচীন ঐতিহ্য বাদ্যযন্ত্র ধামসা, মাদলের তালে তালে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, প্রেম, তাঁদের নৃত্যের দ্বারা বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এভাবে জল, জঙ্গল, গাছপালা, নদী, পাহাড়কে পূজার মাধ্যমে পরিবেশকে রক্ষা করে চলেছেন। এই ভাবে বিরহড় আদিবাসীরাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরব উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করে চলেছেন- এটি হল স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারক এবং বাহক।

৬.৪.৩ বিরহড়দের বাদ্যযন্ত্র (Musical Instrument of Birhors):

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উৎসবে তাঁদের নিজস্ব বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করছেন যেমন - ‘ধামসা’, ‘মাদল’, ‘বানাম’, ‘কাঁসর’ বা ‘ট্যায়ং’, বাঁশের তৈরি বাঁশি, মোষের বা গরুর শিং এর তৈরি একধরণের বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। আদিবাসী খেরওয়াল গোষ্ঠীর মানুষজন যেমন সাঁওতাল, বিরহড়, হো, মুণ্ডা, অসুর, মাহালি, ভীল, কোড়া প্রভৃতি বহু প্রাচীনযুগে পূর্ব ও মধ্য ভারতের ছোটনাগপুর অঞ্চলে এই সকল বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। এই বাদ্যযন্ত্রগুলি আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উৎসব, অনুষ্ঠান, বিবাহ ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়।

আদিবাসীদের এই বাদ্যযন্ত্রে কোন রকম দূষিত পদার্থ অর্থাৎ উপকরণ ব্যবহার করা হয় না, এই বাদ্যযন্ত্রগুলি কোন রকম শব্দ দূষণ করে না, কোন ভাবে কোন ব্যক্তির হৃদরোগের কারণ হয় না, বহু প্রাচীন কাল থেকে আদিবাসীরা এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের কারণে কোন রূপ পরিবেশ দূষণ হয় নি। তাই আদিবাসীরা তাঁদের এই পরম্পরাগত ঐতিহ্যপূর্ণ বাদ্য যন্ত্র বংশ পরম্পরায় বহন করে চলেছেন।

আধুনিক সমাজে আধুনিক বৈদ্যতিক বাদ্যযন্ত্রের কারণে যে শব্দ দূষণের ফলে পরিবেশ তথা মানব সমাজ জর্জরিত হচ্ছে, কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে আদিবাসী সমাজ তাঁদের পরম্পরাগত বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা তাঁদের সংস্কৃতির প্রকাশের মধ্যে দিয়ে পরিবেশ এবং মানব সমাজকে শব্দ দূষণের হাত থেকে বাঁচাবার পথ দেখাচ্ছেন। পরিবেশকে ও মানব সমাজকে রক্ষার জন্য আদিবাসীদের এই বাদ্যযন্ত্র সাংস্কৃতিক স্থিতিশীল উন্নয়নে সহায়ক।

৬.২.২.৪ জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ (Collecting Wood from Forest):

ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের একটি অংশ পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের ঢালে ও পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চলে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা তাঁদের জীবন নির্বাহের জন্য জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে নিকটবর্তী বাজারে বিক্রয় করেন। বিরহড়দের জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ এবং বিক্রি করা তাঁদের প্রধান অর্থনীতি। গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে বিরহড় সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা জঙ্গলের জীবন্ত গাছ কাটেন না, এবং গাছের কাঁচা শাখা-প্রশাখাগুলিও কাটেন না। তাঁরা ঘন জঙ্গলে যে সমস্ত গাছগুলি মরে গিয়ে শুকিয়ে গেছে বা অর্ধ শুকনো এবং যে গাছের শুকনো শাখাপ্রশাখা বা ঝাঁটিপাটি রয়েছে সেই ডালগুলিকেই কাটেন এবং বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যান। এছাড়াও জ্বালানি হিসাবে শুকনো ঝাঁটিপাটিগুলি সংগ্রহ করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। বিরহড়রা জঙ্গলের শুকনো পাতা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য কখনই সংগ্রহ করেন না, এর পিছনে কিছু কারণ রয়েছে। যেহেতু বিরহড়রা জঙ্গলের ঝাঁটিপাটি বা গাছের শুকনো শাখা প্রশাখা ডালগুলি ব্যবহার করেন জ্বালানি হিসাবে, তাই তাঁরা গাছের শুকনো পাতা ব্যবহার করেন না। এছাড়াও শুকনো পাতা ব্যবহার না করার বিশেষ কারণ হল- বছরের একটি বিশেষ ঋতুতে গাছের সমস্ত শুকনো পাতাগুলি ঝরে মাটিতে পড়ে যায়। এরপর বর্ষার জলে শুকনো পাতাগুলি ভিজে পচে জৈব সারে রূপান্তরিত হয়, এবং মাটি উর্বর হয়। ঐ মাটিতে জঙ্গলের গাছের বীজ পড়ে নতুন গাছের জন্ম হয় ও বিভিন্ন ছোট ছোট প্রাণীর ও পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল গড়ে ওঠে। এই ভাবে জঙ্গলে স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে

জীববৈচিত্র্যের প্রক্রিয়া বজায় থাকে। বিরহড়রা কখনই জঙ্গলের জীবন্ত গাছকে কেটে বনজঙ্গলকে ধ্বংস করেন না। তাঁরা কখনই প্রকৃতির সম্পদকে একই বারে ব্যবহার করে শেষ করেন না। দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ও জীবন নির্বাহের জন্য যেটুকু জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করলে তাঁদের জীবন-যাপন চলবে সেই টুকুই জঙ্গল থেকে তাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করেন। কিছু কিছু বিরহড়রা শাল গাছের পাতা সংগ্রহ করলেও তাঁরা কখনই একটি গাছের সম্পূর্ণ পাতাগুলি তুলে নেন না। যে পাতাগুলি গোড়ার দিকে বর পাতা সেই পাতাগুলি তাঁরা তোলেন এবং শাল পাতার থালা তৈরি করেন। বিরহড়রা তাঁদের বাড়িতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কুডুল, কাঠারী, কোদালের বাঁট বা ধরার অংশ তৈরির জন্য কোন কাঁচা গাছের ডাল বা কাঁচা গাছ কাটেন না। অযোধ্যার গভীর পাহাড়ি জঙ্গলে এক ধরনের শক্ত গাছ রয়েছে, সেই গাছটি যতক্ষণ না শুকিয়ে যায় ততক্ষণ বিরহড়রা সেই শুকনো গাছের ডাল বা গাছের গুড়ি সংগ্রহ করে কোদাল, কাটারী এবং কুডুলের বাঁট তৈরি করেন না। বিরহড়রা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানব জীবনের সম্পদ গাছকে সম্পূর্ণ ভাবে কেটে প্রকৃতিকে ধ্বংস করেন না। এই ভাবেই পরিবেশে স্থিতিশীল উন্নয়নকে তাঁরা বজায় রাখেন নিজেদের চাহিদা পুরণের মধ্যে দিয়ে। এই ভাবে বিরহড়রা প্রকৃতিকে রক্ষা এবং বনভূমিকে সুরক্ষিত রাখার মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক বৃদ্ধির পরিবেশও নিশ্চিত করেন। বিরহড় আদিবাসীরা জঙ্গলের শুকনো পাতা জ্বালান না, ফলে পরিবেশ দূষণ মুক্ত হয় এবং গাছের পাতা মাটিতে পড়ে পচে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

৬.২.২.৫ মধু সংগ্রহ (Honey Collection):

পশ্চিমবঙ্গে অরণ্য কন্যা পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের মধু সংগ্রহ পদ্ধতি পরিবেশ ও প্রকৃতির স্থিতিশীল উন্নয়নে ঐতিহ্যগত পরম্পরা রক্ষা করছেন। বিরহড়রা বংশ পরম্পরায় সুউচ্চ পাহাড় এবং জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করেন। সাধারণ মানুষ মধু সংগ্রহের সময় মৌচাকের নিচে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া দেয়, ধোঁয়ার জ্বালায় মৌমাছিরা মৌচাক থেকে বেরিয়ে চারিপাশে ছড়িয়ে যায় এবং কিছু মৌমাছি মাটিতে পড়ে মরে যায়। তখন মধু সংগ্রহকারী যে গাছের ডালে বা পাথরের টিলায় মৌচাকটি রয়েছে, মৌচাকটিকে কেটে বা চেঁছে মধু সংগ্রহ করে। উড়ে

যাওয়া মৌমাছিগুলি ও বেঁচে যাওয়া মৌমাছিগুলি মৌচাক এর স্থানে এলে দেখে যে তাদের মৌচাকের বাসাটি আর নেই। মৌমাছিগুলি ফুল থেকে ফুলের রস সঞ্চয় করার ঘরটি না থাকায় তৎক্ষণাৎ আর সঞ্চয় করতে পারে না। মধু সঞ্চয়ের জন্য দীর্ঘ সময় লাগে। ফলে একদিকে যেমন কিছু মৌমাছির মৃত্যু হয় এবং মৌচাক এর ক্ষতি হয়। মধু সংগ্রহকারী দীর্ঘ সময় ঐ মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ বা মধু পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং আগুন লাগানোর জন্য পরিবেশের বায়ুদূষণ হয়।

কিন্তু বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের মধু সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। বিরহড়রা তীরের সামনের ভাগ খোলা থাকে এবং পিছনের ভাগে সুতির বা লাইলন সুতো দিয়ে বাঁধে। এরপর মধু সংগ্রহের জন্য মৌচাকের স্থানে পৌঁছায় এবং দীর্ঘ গাছে বা পাহাড়ের টিলাতে অবস্থিত মৌচাকে ধোঁয়া না দিয়েই ধনুক দিয়ে তীর মারে মৌচাকের কেন্দ্র বিন্দুতে। তীরের পেছনে বাঁধা সুতো নিচ পর্যন্ত থাকে এবং বিরহড়রা ঐ সুতোর নীচে কোন একটি পাত্র রেখে দেয়। এরপর মৌচাক থেকে মধু একটু একটু করে ঐ তীরের গা দিয়ে ও সুতোর মধ্যদিয়ে নীচে রাখা পাত্রে জমা হয়। এতে বিরহড়দের মধু সংগ্রহ হয়ে যায় তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী। অপর দিকে কোন মৌমাছিকে মারার প্রয়োজন হয় না এবং মৌচাককে একেবারে ভাঙার প্রয়োজন হয় না। এরফলে বিরহড়রা বহুদিন ধরে এই ভাবে একটি মৌচাক থেকে মধু পেয়ে থাকে এবং মৌমাছিরা জীবন্ত থাকে ফলে আগুন, ধোঁয়া না দেওয়ায় পরিবেশ দূষণও হয় না। তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বিহড়রা পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে সহযোগিতা করেন এবং তাঁদের যে টুকু প্রয়োজন সেই টুকু তাঁরা জঙ্গল থেকে ও প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করেন।

৬.৪.৬ দড়ি তৈরি (Rope Making):

পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলার মোট আদিবাসী সম্প্রদায়দের মধ্যে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১ শতাংশ। পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী, বলরামপুর, ঝালদা-১ ব্লকের অধীনে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের বসবাস। বিরহড়দের প্রধান কাজগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দড়ি তৈরি করা। বিরহড়রা গভীর জঙ্গল ও খাড়া পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে 'চিহরলতা' গাছ থেকে চিহরলতার তন্তু বা গাছের ছাল কেটে সংগ্রহ করেন। চিহরলতা গাছের ছাল সংগ্রহের সময় বিরহড়রা কখনই সম্পূর্ণ

গাছকে কেটে গাছের ছাল বা চিহরলতা তন্তু সংগ্রহ করেন না। মূল গাছের যে সমস্ত লতানো শাখা প্রশাখা রয়েছে সেই গুলি কাটেন। চিহরলতা সংগ্রহের পর লতাগুলি কিছু ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখেন এবং পরে লতাগুলিকে শুকনো হতে দেওয়া হয়। এরপর চিহরলতা তন্তু বা গাছের ছালগুলি পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ি তৈরি করা হয়। এই ভাবে বিরহড়দের দড়ি তৈরির জন্য জঙ্গল থেকে প্রকৃতিকে ও প্রাকৃতিক সম্পদকে একে বারে শেষ না করে তাঁরা চিহরলতা সংগ্রহ করার মধ্যে দিয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন দড়ি তৈরির জন্য সেটি স্থিতিশীল উন্নয়নের বিশেষ উদাহরণ। কারণ বিরহড়দের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দড়ি তৈরি করা এবং বাজারে বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করা, এতে জঙ্গলের কোন ক্ষতি হয়না এবং সম্পূর্ণ ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ গাছের ক্ষতি হয় না, চিহরলতার মূল গাছটি কখনও কাটা না হওয়ার কারণে দীর্ঘ সময় বিরহড়রা বহু বছর ধরে 'চিহরলতা' সংগ্রহ করতে পারেন।

বর্তমানে গভীর জঙ্গলে বিরহড়দেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না অর্থাৎ ফরেস্ট অফিসাররা কোন অনুমতি না দেওয়ায় এবং সামনের জঙ্গলে 'চিহরলতা' আর ভালো না পাওয়ায় চিহরলতার দড়ি তৈরি অনেক কমে গেছে। সুতুরাং সামনের জঙ্গল থেকে যে টুকু চিহরলতা সংগ্রহ করতে পারেন সেটা দিয়ে দড়ি তৈরি করেন। বর্তমানে বিরহড়রা তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা বৃদ্ধির জন্য পড়ে থাকা সিমেন্টের বস্তা থেকে প্লাস্টিক সুতো বার করেন, এবং ঐ সুতো দিয়ে দড়ি তৈরি করেন। এটি স্থিতিশীল উন্নয়নের একটা বিশেষ ব্যবস্থা। বর্তমানে বিভিন্ন আধুনিক পাকাবাড়ি, ঢালাই রাস্তা, ইত্যাদি নির্মাণকার্যে সিমেন্ট ব্যবহারের পর প্লাস্টিক সিমেন্টের বস্তা বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকে যেমন-রাস্তা, নদী, খাল-বিল, চাষযোগ্য ভূমি ইত্যাদিতে। সেখানে জল দূষণ, মাটি দূষণ এবং বস্তাগুলি জ্বালানোর পর বায়ু দূষণের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় ও প্রকৃতির ক্ষতি হয়। বিরহড়রা তাঁদের পরম্পরাগত চিন্তাভাবনা এবং পরিবেশকে রক্ষার স্বার্থে সিমেন্টের বস্তাগুলি সংগ্রহ করেন। ফলে ঐ বস্তাগুলি থেকে একটা একটা করে সিমেন্ট বস্তার প্লাস্টিক সুতো বের করেন এবং তাঁদের প্রাচীন পদ্ধতির মাধ্যমে

প্লাস্টিক সুতোগুলিকে পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ি তৈরি করেন। এরপর দড়ি তৈরি হয়ে গেলে বাজারে বিক্রি করেন। এই ভাবে বিরহড়রা এক দিকে তাঁদের জীবন নির্বাহের জন্য অর্থনৈতিক ভাবে সবল হচ্ছেন, এবং অপরদিকে সিমেন্টের প্লাস্টিক বস্তাগুলিকে পুনরায় ভিন্ন রূপে ব্যবহার যোগ্য করে তোলায় স্থিতিশীল উন্নয়নে সমাজ তথা পরিবেশ রক্ষার অবদান রেখে যাচ্ছেন।

৬.২.২.৭ হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া (Handi or Haria):

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের বসবাস। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের জীবন যাপন, সংস্কৃতি, ভাষা, রীতিনীতি ভিন্ন। অনেকগুলি আদিবাসী গোষ্ঠীতে প্রাচীন পরম্পরার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরম্পরাগত বিষয় রয়েছে যেটি আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতিতে ব্যবহার হয় সেটি হল 'হাণ্ডি'। 'হাণ্ডি' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল 'হাঁড়িয়া'। এই 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' খাদ্য বস্তুটি আদিবাসীদের বহু প্রাচীন একটি পরম্পরাগত পানীয়, যেখানে আদিবাসীদের জন্ম থেকে শুরু করে বিবাহ, পরব, উৎসব-অনুষ্ঠান, জাগরণ, আদিবাসী পাতা পরব, কেউ মারা গেলে, বাড়িতে কোন আত্মীয় এলে, প্রকৃতির পূজা এবং বিভিন্ন পূজার স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া ব্যবহার করা হয়। সুতরাং 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' তৈরির জন্য আদিবাসীরা বিশেষ পদ্ধতি এবং স্থিতিশীল প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করেন। তাই 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' তৈরির জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন হয় সেগুলি হল- একটি পোড়া মাটির হাঁড়ি ও ঢাকা দেওয়ার জন্য মাটির তৈরি সরা বা ঢাকনা, চাল, জল, ভেষজ গাছগাছড়া থেকে তৈরি রান বা রানু ইত্যাদি। আদিবাসীরা যে পদ্ধতিতে 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' তৈরি করেন তা গবেষক নিজের চোখে সম্পূর্ণ দেখেছেন, পদ্ধতিটি হল- আদিবাসীরা প্রথমে মাটির হাঁড়িটিকে উনুনে চাপিয়ে দিয়ে কিছুটা গরম হলে হাঁড়িতে চাল দিয়ে দেয় এরপর কিছুক্ষণ চালটিকে ভাজতে হয়, চালের উপরের অংশ কিছুটা পুড়ে গেলে অর্থাৎ হালকা ভাবে ভাজা হলে চালটিকে একটি পাত্রে নামিয়ে রাখা হয়। এরপর মাটির হাঁড়িটিতে অর্ধেকের বেশি জল দেওয়া হয়, জল গরম হওয়ার পর ঐ ভাজা চালগুলি হাঁড়ির ফুটন্ত জলে দিয়ে দেওয়া হয়, সাথে মাটির তৈরি সরাটি হাঁড়ির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ৩০ থেকে ৪০ মিনিট চালগুলি ফোটানো হয় অর্থাৎ সেদ্ধ করা হয়। চালগুলো ভাতে রূপান্তরিত হলে এবং হাঁড়িতে জল শুকিয়ে এলে উনুন থেকে নামিয়ে রাখা হয়। এরপর হাঁড়ি থেকে ভাতগুলি বের করে পরিষ্কার কোন কাপড়ে ঢেলে চারিয়ে (অর্থাৎ ছড়িয়ে) দেওয়া হয় যাতে ঐ ভাতে কোন অতিরিক্ত জল না থাকে এবং ভাতগুলিকে ঠাণ্ডা করা হয়। সর্বশেষে বিশেষ উপকরণ মিশ্রণ করতে হয় সেটি হল 'রানু' বা 'রান', এটি হল গভীর জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা ১৫ থেকে ২০ ধরনের

ভেষজ উদ্ভিদের শেকড়, কাণ্ড, জড়িবুটি, বীজ ইত্যাদির মিশ্রণ। এই 'রানু' বা 'রান' ২ কেজি চালের জন্য প্রায় ৬-৭ টি গুটি পাউডার তৈরি করে মেলে রাখা ঐ ভাতে ভালোকরে মাখিয়ে কিছুটা সময় রেখে দিতে হয়। এরপর আদিবাসী মহিলারা ঐ মাটির হাঁড়িতে ভাতগুলিকে ভরে নেন, তারপর কিছুটা পরিমাণ জল হাঁড়ির মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয় এবং ভাত ভর্তি হাঁড়ির মধ্যে গুঁড়ো করা রান বা রানু কিছুটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়, অবশেষে মাটির তৈরি সরাটি হাঁড়ির মুখে চাপিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় যাতে বাইরের বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। তারপর কিছুদিন পর অর্থাৎ প্রায় ৫/৬ দিন পর দেখা হয় ভাতটি 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া'তে রূপান্তর হয়েছে কি না, যদি দেখা যায় ভাত থেকে একধরণের জলের মত তরল রস জমেছে তাহলে বোঝা যায় খাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই সময় আদিবাসী পুরুষ এবং মহিলারা আর একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাঁড়িয়া খাওয়ার উপযোগী করে তোলে। সেটি হল- একটি পরিষ্কার পাতলা কাপড় বা ঘন জাল জাতীয় জিনিসের উপর হাঁড়ি থেকে একবাটি ভাতটি তুলে রাখা হয় এবং দুই প্রান্তে থাকা দুই ব্যক্তি ঐ ভাত রাখা কাপড়টিকে তুলে রাখেন এরপর একজন ঠাণ্ডা জল ও শীতের সময়ে হালকা গরম জল ঐ ভাতটির উপর ঢালেন এবং অপর একজন হাত দিয়ে ভাতটিকে কাপড়টির উপর ঘষে ছাঁকেন এবং নিচে একটি পাত্র থাকে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' বের করা হয়। আর বাকি পড়ে থাকা ভাতের অংশ মাটিতে ও গাছের গোড়ায় রেখে দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট অংশ পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর ভাত থেকে তৈরি হওয়া 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' পানীয় খাদ্য হিসাবে আদিবাসী মানুষরা পান করেন।

গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে প্রায় ৫ থেকে ৬ দিন হাঁড়িতে ভাত থাকার পর যখন দেখা হয় তখন ভাতগুলি কিন্তু পচে না, ভাতের উপরের যে অংশ থাকে তা খোলা থাকে। কিন্তু আমরা দেখেছি বাড়িতে ভাত রান্না করে রেখে দিলে পরের দিন কিছু সময় পার হওয়ার পর পচতে থাকে। কিন্তু এখানে ভাতটিকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থাপনা এই পদ্ধতিতে কোড়া হয়।

গবেষক আদিবাসী সমাজ থেকে এবং তাঁর উপলব্ধি থেকে জানতে পেরেছেন যে আদিবাসীদের হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া তৈরির একটা বিশেষ চাহিদা এবং ইতিহাস রয়েছে, তা হল- ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে আদিবাসীরা কৃষি কাজের উন্মোচন করেন, তখন বছরের একটি সময়ে অর্থাৎ বর্ষার জলে কিছুটা ধান চাষ হত। কিন্তু বছরের নির্দিষ্ট সময়ে চাষ হলেও ফসল বেশি হত না এবং সেই সামান্য টুকু ফসল সারা বছর চালানো আদিবাসীদের কাছে একটা বিশেষ গুরুতর সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন পোকামাকড়ের প্রভাবে কিছু ফসল বছর ঘুরতে না ঘুরতে অনেকটা নষ্ট হয়ে যেত। সারা দিনরাত্রে একবেলা খেয়ে জীবন যাপন করতে হত, কখনও শিকার পাওয়া যেত কখনও পাওয়া যেত না।

আদিবাসীরা একবার ভাত রান্না করলে তাঁর পরের দিন সেই ভাত ভালো থাকতো না, গ্রীষ্ম কালে সকালে রান্না করলে দুপুরের পরে ভাত নষ্ট হয়ে যেত, কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করার পর কাজ থেকে বিকালে ফিরে এলে খাবার না থাকায় খালি পেটেই থাকতে হত। একদিকে পরিবারের সংখ্যা বেশি থাকায় যত টুকু শস্য থাকতো অনেকটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চালাতে হত। খেরওয়াল গোষ্ঠীর আদিবাসীরা তাঁদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তাভাবনা করে পানীয় খাদ্য 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' প্রস্তুত করেন। তাঁরা দেখেন ১ কিলো চালের ভাত ৫ থেকে ৬ জন পর্যন্ত খেতে পারেন, এবং এই ভাত পেটে বেশিক্ষণ স্থায়ী নয়। কিন্তু অপরদিকে ১ কিলো চালের 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' ১০ থেকে ১৫ জন পান করে সারাদিন থাকতে পারেন ও শরীরে শক্তি থাকে এবং দিন যাপন করা যাবে, এমনকি প্রায় এক সপ্তাহেরও বেশি দিন এর স্থায়িত্ব। এভাবে সঞ্চয় করা শস্য অনেক বেশি দিন পর্যন্ত চালানো সম্ভব।

তবে এই 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' যেহেতু ভেষজ গাছগাছড়া ও চাল দিয়ে তৈরি তাই এটি পান করলে শরীর ঠাণ্ডা এবং বিভিন্ন প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাই আদিবাসীরা গ্রীষ্ম কালে যখন চাষ হতনা তখন গরমের সময় তাঁরা এই 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' বেশি পান করতেন। অপরদিকে বর্ষার সময়ে চাষ হত এবং শীতকালে হাঁড়িয়া পান কম করতেন। এই ভাবে আদিবাসীদের জীবন নির্বাহের জন্য 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়ার' ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই যুগ যুগ ধরে আদিবাসীদের বিভিন্ন পালাপার্বণ, উৎসব, অনুষ্ঠান, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পূজার স্থান ইত্যাদি সমস্ত স্থানে 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া'র ব্যবহার সর্বত্র। বহু বছর ধরে আদিবাসীদের বাঁচিয়ে রেখে ছিল এই পানীয় খাদ্য।

এই 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' স্থিতিশীল উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে, সেটি হল- গবেষক উপলব্ধি করেন যে 'হাণ্ডি' তৈরি হয় প্রাকৃতিক শস্য চাল এবং প্রায় ১৫-২০ টির বেশি ভেষজ গাছগাছড়া দিয়ে, যেটি বিভিন্ন রোগনিরাময়ের বিশেষ উপাদান। যখন 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া'র অবশিষ্ট ভাতের অংশটি মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় ও কোন গাছের গোড়ায় দেওয়া হয় তখন সেটি মাটির সাথে মিশে গিয়ে জৈব সারে পরিণত হয় এবং মাটির গুনাগুন অনেকাংশে বেড়ে যায়, কারণ তার মধ্যে ১৫ থেকে ২০ ধরনের ভেষজ ওষধি গাছের শেকড়, কাণ্ড, বীজ, ফল ইত্যাদি আছে। এছাড়াও 'হাণ্ডি'র বাকি অংশ ভাতটি পুকুরের জলে ফেলা হয়, ফলে পুকুরের যত ছোট উদ্ভিদ, ছোট প্রাণী রয়েছে তাদের বিকাশ হয় কারণ পুকুরের মাটি উর্বর হয় এবং পুকুরের বাস্তুতন্ত্র স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলে। এছাড়া প্রকৃতির কোন ক্ষতি হয়না এবং মানুষেরও কোন ক্ষতি হয়না।

তবে বর্তমানে হাণ্ডি বা হাঁড়িয়ার ব্যবহার সিমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন রয়েছে। একটা সময় এই হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া আদিবাসীদের বাঁচিয়ে রাখার ও জীবনের স্থিতিশীল উন্নয়নে বিশেষ অবদান

রেখেছে। কিন্তু বর্তমানে নিয়ন্ত্রনহীন ব্যবহারে আদিবাসী যুবক সমাজ উন্নয়নের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরছে। যেমন- জল আমাদের জীবন দেয় কিন্তু সেই একই জল বন্যার রূপ নিলে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগত ধ্বংস হয়।

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল এবং আলোচনা

(The Findings and Discussion)

৭.১ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল (The Findings in Research):

গবেষক গুণগত মান ভিত্তিক গবেষণা থেকে যে ফলাফলগুলি প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলি হল-

১) বিরহড়রা প্রথম ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত পালামৌ এবং হাজারীবাগ অঞ্চলকে এদের আদিম বসবাসের স্থান হিসেবে গ্রাহ্য করে।

২) প্রকৃতিগত ভাবে বন্য স্বভাবের হলেও এরা অন্য কোনো জাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠীর পক্ষে ক্ষতিকারক নয়।

৩) উচ্চ পাহাড়, পাহাড়ের শিরাগুলিতে এবং পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে এরা বাস করতে পচ্ছন্দ করে, যদিও পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের উচ্চ এলাকা থেকে এদেরকে নামিয়ে এনে পাহাড়ের পাদদেশে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

৪) শিক্ষার দিক থেকে বিরহড় ছেলে মেয়েরা খুব কম সংখ্যকই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পৌছাতে পেরেছেন। একটি মাত্র গ্রামে দুইটি মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন। এবং একটি মেয়ে নিকটবর্তী ঝাড়খণ্ডের কলেজে B.A পড়ছেন।

৫) বিরহড়দের নিকটবর্তী লোকালয়ে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। তাই প্রাথমিক স্তরেই বিরহড় ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলছুট হয়ে যায়।

৬) কোন বিরহড় গ্রামেই প্রথাবহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি হয়নি।

৭) মহিলা মঙ্গল সমিতিও কোনো বিরহড় গ্রামে তৈরি হয়নি। এবিষয়ে সরকারী বা বেসরকারি ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগও চোখে পড়েনি।

৮) সমস্ত বিরহড় গ্রামেই বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরাও স্কুলে যেতে অনাগ্রহী যদিও স্কুলে মধ্যাহ্নকালীন আহার পাওয়া যায়।

৯) বাবা মায়ের দূরদর্শিতার অভাব, চরম দারিদ্র্য, অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদির কারণে অভিভাবকরাও ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য সক্রিয় হতে পারেন না।

১০) কোনো বিরহড় গ্রামেই যুবক-যুবতী বা বয়স্কদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

১১) ২০২৫ সালে বাঘমুণ্ডি ব্লকের অধীনে প্রথম বার মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন একসাথে চারজন বিরহড় মেয়ে।

১২) বিরহড়রা প্রকৃতিগতভাবে লাজুক স্বভাবের, তাই বাইরের লোকজনের সামনে মুখ ঢেকে রাখতে পছন্দ করেন।

১৩) বিরহড়দের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি রয়েছে। এরা নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। কোনো অবস্থাতেই নিজস্ব সমাজ এবং সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হওয়া এরা পছন্দ করেন না।

১৪) বিরহড়রা তাঁদের নিজস্ব 'বিরহড়' ভাষায় কথা বলেন। বিরহড় ভাষার সঙ্গে সাঁওতাল, হো ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিরহড় ভাষা খেরওয়াল ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

১৫) বিরহড়দের মোটামুটি পাঁচ ধরনের বিবাহ রয়েছে।

১৬) বিরহড়দের বিবাহ পদ্ধতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে মিললেও কিছুটা ক্ষেত্রে এদের বিবাহ পদ্ধতি পৃথক।

১৭) বিবাহের পূর্বে বিবাহ যোগ্য পুরুষরা 'টাণ্ডা' বা পাড়ার বাইরে সামান্য দূরত্বে একটি ঘরে ঘুমায়। একইভাবে বিবাহের পূর্বে বিবাহ যোগ্যা মেয়েরা টাণ্ডা থেকে সামান্য দূরত্বে একটি ঘরে ঘুমায় এবং মেয়েদের সঙ্গে থাকে একজন বিধবা বৃদ্ধা।

১৮) বিভিন্ন টাণ্ডাতে বসবাসকারী বিরহড়দের সামাজিক জীবনের প্রথা এবং ধর্মীয় রীতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১৯) শিকারের ক্ষেত্রে এরা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে যা অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় না। দলবদ্ধ শিকারে যা পাওয়া যায় তা 'টাণ্ডার' প্রতিটি পরিবারের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়।

২০) বিরহড়দের পাঁচ প্রকারের উৎসব রয়েছে যেমন- বাহা, করম, সারহুল, সেন্দ্রা অর্থাৎ শিকার উৎসব, সহরায় প্রভৃতি।

২১) সারহুল এবং বাহা উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিরহড় নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতীরা সকলেই জল, জঙ্গল, গাছপালা, নদী, পাহাড়কে পূজা করে এবং এর মাধ্যমে পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখে।

২২) টামাক বা ধামসা, তুমদা বা মাদল, ট্যাঁয়ং বা কাঁসর, বানাম বা একতারা, তিরীও বা বাঁশের তৈরি বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এরা ব্যবহার করে বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান কালে গান, বাজনা ও নাচের সঙ্গে। এই যন্ত্রগুলি এমনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে এবং দেশীয় জ্ঞান ব্যবহার করে তৈরি হয় যে, যন্ত্র তৈরির উপাদানগুলি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে প্রকৃতিকে বিষাক্ত করে তুলবে না। এমনকি এই সকল বাদ্যযন্ত্রের শব্দ মানুষ বা প্রাণীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনো ভাবেই ক্ষতিকারক নয়।

২৩) সমস্ত বিরহড় গ্রামেই সরকারী অর্থে বিশেষ ভাবে বিরহড়দের ব্যবহারের জন্য নিজস্ব সম্প্রদায় হল (Community Hall) রয়েছে।

২৪) প্রায় বেশীরভাগ বিরহড় গ্রামের পুরুষ এবং মহিলারা তাদের দেশীয় পানীয় খাদ্য হাঁড়িয়া পান করেন, তাঁদের প্রায় সমস্ত উৎসব, অনুষ্ঠানে হাঁড়িয়া খাওয়া এঁদের সংস্কৃতির অঙ্গ। এছাড়া মহুল বা মহুয়া ফুল রান্না করে তরকারী হিসাবে খান।

২৫) বিরহড়রা নিজস্ব বিরহড় সমাজেই বিয়ে করেন। বিয়ে করার জন্য ছেলে বা মেয়ে না পাওয়া গেলেও এরা অন্য আদিবাসী বা অ-আদিবাসীকে বিয়ে করেন না। বিরহড় সমাজের বাইরে কাউকে বিয়ে করলে পরিবার/ছেলে/মেয়েকে জরিমানা হিসাবে সমাজকে দিতে হয় তিনটি মোরগ, ছাগল এবং ৪-৫ হাজার টাকা।

২৬) এখনো পর্যন্ত এরা চাষের কাজে বিশেষ আগ্রহী নয়।

২৭) এখনো এরা অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করতে পছন্দ করেন।

২৮) বিরহড়রা জীবিকা হিসাবে জঙ্গল থেকে বিভিন্ন বনজ সম্পদ যেমন- শালপাতা, চিহরলতা, জ্বালানি কাঠ, মধু এবং মোম সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। অনেক ক্ষেত্রে বানর ধরে তাকে পোষ মানান এবং লোকালয়ে বানরের খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করেন।

২৯) সমস্ত বিরহড় পরিবারই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। জঙ্গল থেকে যে বনজ সম্পদ বিরহড়রা সংগ্রহ করেন তা তাঁদের পেট ভরানোর পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় এঁরা অন্যের জমিতে দৈনিক মজুর এবং বাড়ি তৈরির কাজে দৈনিক মজুর হিসাবে কাজ করেন।

৩০) চূড়ান্ত দারিদ্র্যের কারণে বিরহড়দের পরিবারে প্রায় কোনো আসবাবপত্রই নেই। রান্না খাওয়ার জন্য এ্যালুমনিয়ম, স্টিল, কাঁসার, ও লোহার তৈরি থালা-বাসন, কড়া, খুন্তি, চাটু ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া টিনের কিছু উপকরণমাত্র রয়েছে।

৩১) অর্থের অভাবে কোনো কোনো গ্রামে বিবাহ যোগ্য বিরহড় যুবকরা বিয়ে করতে পারেনি। ফলে ডাকাই গ্রামে বিরহড়দের পরিবার সংখ্যা এবং জনসংখ্যা দ্রুতহারে হ্রাস পেয়েছে।

৩২) প্রায় সমস্ত বিরহড় পরিবারেই গবাদি পশু রয়েছে। আর্থিক প্রয়োজনে পরিবারগুলি এই গবাদি পশুকে বিক্রি করে দৈনন্দিন সংসার চালান।

৩৩) পুরুলিয়া জেলায় প্রতিটি বিরহড় গ্রামেই দ্রুততার সাথে ক্রমশ বিরহড় জনসংখ্যা কমছে।

৩৪) অনেক বিরহড় ছেলে গ্রামে এবং স্থানীয় অঞ্চলে উপযুক্ত কাজ না পাওয়ার কারণে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।

৩৫) বিরহড়দের মধ্যে আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এরা তাঁদের প্রাচীন জ্ঞানকে আজও শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলে যা তাদের স্থিতিশীল উন্নয়নের সহায়ক। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বিরহড় সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা তাদের দেশীয় জ্ঞানকে আজও ব্যবহার করে চলেছে। যেমন-

ক) বিভিন্ন প্রজাতির গাছ এবং প্রাণীকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনে এরা বনাঞ্চলের মধ্যে নির্দিষ্ট পবিত্র স্থান চিহ্নিত করে যেখানে প্রাচীনকাল থেকে অদ্যবধি কোনো মানুষের স্পর্শ পড়েনি। এর মধ্যে দিয়ে তারা স্থিতিশীল উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করছে।

খ) বিরহড়রা গভীর জঙ্গলে বসবাস করে এবং জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো ওষধি গাছকে ব্যবহার করে এরা নিজেদের এবং টাণ্ডার সমস্ত মানুষদের চিকিৎসা করে। এই ওষধি গাছগুলি রোগীর শরীরের উপর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া করে না। এছাড়াও এরা জঙ্গল থেকে যখন ওষধি গাছ সংগ্রহ করে তখন একটি এলাকার সমস্ত গাছ এরা তুলে নেয় না। স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে এরা কিছু গাছ সংগ্রহ করে মাত্র। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো ওষধি গাছের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হবে এমন অংশ টুকু মাত্র সংগ্রহ করে। এতে করে কোনো এলাকায় ওষধি গাছের অভাব হয় না।

গ) জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাচীন কাল থেকে বিরহড় আদিবাসীরা তাদের বসবাসের স্থানে ছোট ছোট পুকুর বা কুঁয়ো কেটে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

ঘ) বনজ সম্পদ সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার কাজে এদের দ্বারা ব্যবহৃত ভেষজ উদ্ভিদ আজও আধুনিক সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাঁরা জানেন কিভাবে জঙ্গলকে ব্যবহার করলে তার স্থায়িত্বকে সুরক্ষিত রাখা যায়।

ঙ) তাঁদের দেশীয় জ্ঞান ব্যবহার করে এঁরা মৃত্তিকা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সম্পদ সমূহকে সুরক্ষিত করছেন-'Homestay', 'Ecotourism' এবং 'Participatory Forest Management' এর অন্যতম প্রধান উদাহরণ।

৩৬) লক্ষণীয় যে বিরহড়রা কখনই জঙ্গল থেকে কাঁচা বা জীবন্ত গাছ কাটেন না। জঙ্গলে যে গাছগুলি শুকিয়ে গেছে সেইগুলি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাছের সরু শাখা প্রশাখা সংগ্রহ করেন এবং জ্বালানি হিসাবে বাজারে বিক্রি করেন।

৩৭) স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বিরহড় আদিবাসী মানুষরা মৃতদেহকে সৎকার করেন নির্দিষ্ট স্থানে সমাধি দিয়ে। কারণ এরা মনে করেন যে মৃতদেহকে দাহ করলে পরিবেশ দূষিত হবে।

৩৮) বিরহড় মহিলারা হাত, হাঁটু এবং বুকে ট্যাটু করে, কিন্তু কখনই মুখে ট্যাটু করে না।

৩৯) এরা নিজেদেরকে হিন্দু বা সিন্ধু বলে পরিচয় দেন। এরা প্রকৃতিকে মানেন। মারাংবুরু, জাহের আয়ঃ, সিং বোঙ্গা এবং বিভিন্ন দেব-দেবী ও ঈশ্বরকে পূজা করেন। এছাড়া ভূত-প্রেত, মহামায়া প্রভৃতি অশুভ শক্তির অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেন। বহু পূর্বে বিরহড়দের ঘরগুলি ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন- ৮-১০ ফুট লম্বা, ৬ ফুট চওড়া, ৬ ফুট উচ্চতা, দরজার উচ্চতা ২ ফুট এবং প্রস্থ ১.৫ ফুট।

৪০) বিরহড়দের পূজার নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে যা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে খাপ খায় না। এদের পূজার জন্য একটি নির্দিষ্ট পবিত্র স্থান থাকে – অন্যান্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

৪১) বিরহড়দের পূজার পবিত্র স্থানকে জাহের থান বা জিলু জাহের বলে। তাঁরা মনে করেন সেন্দ্রা বোঙ্গা এই পবিত্র স্থানে বাস করেন। তাই শিকারে যাওয়ার পূর্বে শিকারের জাল এবং অস্ত্রকে এই স্থানে রাখে এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে মোরগ উৎসর্গ করে।

৪২) সাধারণত বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তাদের গোত্র স্থির হয়। বিরহড়দের গোত্র লিঙ্গ ভিত্তিক নয়।

৪৩) মৃত্যুর পর বিরহড়রা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, এরা আত্মার লিঙ্গভেদ মানে। এদের মৃতদেহের সৎকার পদ্ধতিও অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় পৃথক। মৃতদেহকে তারা দাহ করে না, তারা কবর বা সমাধি দেয়।

৪৪) পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী বিরহড়রা প্রায় সকলেই স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। গর্ভবতী মহিলারা স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সন্তান প্রসব করেন।

৪৫) বিরহড়দের সাপে কামড়ালে তারা ওঝা বা গুনিনের কাছে না গিয়ে সাপে কাটা রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

৪৬) পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী বিরহড়দের কারুরই নিজস্ব কোনো চাষযোগ্য জমি বা বসবাসের জমি নেই। সরকার থেকে দেওয়া খাস জমিতেই এদের জন্য পরিবার পিছু দুই কামরার বাড়ি সরকার থেকে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সরকারী পুনর্বাসন প্রাপ্ত বিরহড়রা যে এলাকায় থাকেন সেখানে পানীয় এবং স্নানের জলের খুবই অভাব রয়েছে। বসবাসের জমি অত্যন্ত রুক্ষ এবং পাথুরে, তাই সামান্য কিছু সব্জি চাষও অসম্ভব।

৪৭) রাজনীতির সঙ্গে বিরহড় যুবক-যুবতীরা কোনো ভাবেই যুক্ত নয়। রাজনীতি বিষয়ে এদের কোনো আগ্রহ নেই।

৪৮) পুরুলিয়া জেলায় প্রাপ্ত বয়স্ক বিরহড় আদিবাসীদের ভোটার কার্ড থাকলেও এদের বেশির ভাগ জনের আধার কার্ড, রেশন কার্ড, জব কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, এস টি শংসাপত্র নেই। কিছু জনের এই

বিষয়ে আগ্রহ নেই, তবে বেশির ভাগ বিরহড়রা স্থানীয় সদস্য এবং পঞ্চায়েত প্রধানকে তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন।

৪৯) বিরহড় আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন মহিলা ব্যাতিরেকে বেশিরভাগ মহিলারা ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ এবং ‘বিধবা ভাতা’ পান না।

৫০) সরকার থেকে বিরহড়দের বাড়ি করে দিলেও তারা নিজেদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে না। কারণ ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা এরা এখনো বোঝে না।

৫১) বেড়সা গ্রামে পাহাড়ের ঢালে বিরহড়রা বসবাস করেন, যেখানে বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছরই জলের কষ্ট। তাই সরকার থেকে সৌর চালিত সাবমারসাল জলের ট্যাঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে। ডাকাই গ্রামে পঞ্চায়েত থেকে একটি নলকূপ বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যদিও কয়েক দিনের মধ্যেই নলকূপটি নষ্ট হয়ে যায়। পঞ্চায়েত বা সরকার থেকে বহুবার বলা সত্ত্বেও নলকূপটিকে ঠিক করা হয়নি। ফলে শীত এবং গ্রীষ্ম কালে পাহাড় থেকে চুঁইয়ে আসা জল সংগ্রহ করে এদের পানীয়, এবং রান্নার কাজ চলেছে।

৭.২ আলোচনা (Discussion):

যে কোনো স্থায়ী সুসংগঠিত সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট সমাজ তাত্ত্বিক অধ্যাপক সরোকিন বলেছেন যে, জনগনের পর্যায়ক্রমিক বিভাগকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের দুই বিপরীত মেরুতে রয়েছে যথাক্রমে উচ্চতর শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণী। আবার সামাজিক স্তরবিন্যাসের একদিকে ধনী শ্রেণী ও অপর দিকে দরিদ্র শ্রেণী থাকে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক স্তরবিন্যাস সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্যের একটি প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। বটোমোর মনে করেন, সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে ও শ্রেণিতে সমাজের বিভাজন। এই সমাজ বিভাজনের ভিত্তিতে সমাজে তৈরি হয় ক্ষমতা ও মর্যাদার ক্রম উচ্চ বিন্যাস কিংবা ক্রম নিম্ন বিন্যাস।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আদিবাসী বা অনার্যদের আমরা দেখতে পাই। এই আদিবাসীরা ভারতীয় সংবিধানে ৩৩৬(২৫) নং ধারায় এবং ৩৪২ (১) নং ধারায় তপশীলি উপজাতি

হিসাবে আলোচিত হয়েছেন। এরা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিছিন্ন, প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, এমনকি ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে অসমর্থ।

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করল তখন স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তপশীলি উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য সংবিধানের ১৫, ১৬ (৪), ৩২০ (৪), ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫, ১৯ (৫), ৪৬, ৩৪২, ৩৩৯ (২), ১৬৪, ৩৩৮, ২২৪ এবং ২৭৫ (১) নং ধারায় আদিবাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাঁদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দানের কথা ঘোষণা করেছেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকার কাকা কার্লেকার- এর নেতৃত্বে 'Backward Classes Commission' (1953-55) স্থাপন করেন এবং কমিশনকে দায়িত্বদেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলি জানার এবং কীভাবে সমস্যা সমূহের সমাধান সম্ভব তার রূপরেখা তৈরি করার। ভারত সরকার পুনরায় ১৯৫৪-১৯৫৯ সালে গঠন করেন 'The Study Team of Social Welfare of Backward Classes'. এর নেতৃত্বে ছিলেন রেনুকা রায়। উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক উন্নয়ন সাধন। প্রথম Backward Classess Commission (১৯৫৩-১৯৫৫) গঠিত হওয়ার প্রায় চব্বিশ বছর পর B. P. Mondal -এর নেতৃত্বে ভারত সরকার গঠন করেন Second Backward Classess Commission (১৯৭৯-১৯৮০)। সুতরাং ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। বিভিন্ন গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

আদিবাসী সমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে জানলেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্যাকে অনুধাবন করা সম্ভব। গুহ এবং ইসমাইল (২০১৫) এর গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। বর্তমান গবেষকও বিরহড় সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ সময় বাস করে এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে। বর্তমান গবেষক লক্ষ্য

করেছেন যে বিরহড় আদিবাসীরা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির এবং নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির বাইরে বের হতে পারে না। সরেন (২০১৩) লক্ষ্য করেছেন যে, আদিবাসী যুবক-যুবতীরা নিজ এলাকায় অর্থ উপার্জনের সুযোগ না পাওয়ায় বাধ্য হন পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিম ভারতে কাজ করতে যেতে। এখনো উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে কর্মরত সমস্ত শ্রমিকই আদিবাসী সম্প্রদায়ের এবং তারা দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত। বর্তমান গবেষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে যে তথ্য পেয়েছেন তার থেকে জানা গেছে যে, বিরহড় সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীরা অল্প ক্ষেত্রে হলেও পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দক্ষিণ ভারতে কাজে গিয়েছেন। পরিযায়ী প্রকৃতির কারণে এরা নিজ সমাজে বসবাস করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ফলে নিজস্ব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংস্কৃতিতে যুক্ত থাকতে পারেন না।

বাইরের অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের বেশভূষা, আদবকায়দা, খাদ্যাভ্যাস, জীবনচর্চা প্রভৃতির প্রভাব পড়ে এদের উপর। চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান ব্যবহার করে এরা জঙ্গল থেকে ওষধি গাছ সংগ্রহের সুযোগ পান না। ফলে আধুনিক আলোপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ নিতে এরা বাধ্য হয়। এর ফলশ্রুতিতে এদের অনভ্যস্ত শরীরে আলোপ্যাথি চিকিৎসার যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে তাতে এদের মৃত্যুও ঘটছে। সুতরাং চিরাচরিত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিরহড়রা মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়ে খুব ভালো নেই একথা বলা যায়।

বিরহড় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষার আলোক আজও প্রায় পৌঁছায়নি। বর্তমান গবেষক পুরুলিয়া জেলার সমস্ত বিরহড়দের গ্রাম ঘুরে একটি মাত্র মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন যে ঝাড়খণ্ডের একটি কলেজে হিন্দীকে প্রধান বিষয় নিয়ে স্নাতক স্তরে পাঠরত। বাঘমুণ্ডি ব্লকের অধীনে ভূপতিপল্লী এবং বাড়েরিয়া গ্রাম থেকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে বিরহড় গোষ্ঠীর চারজন মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেছে। বহুধরণের সমস্যার মধ্যে থেকেও বিরহড় মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি আদিবাসী সমাজকে উদ্দীপিত করেছে। ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষার পরে অর্থ উপার্জনের জন্য তারা আর লেখাপড়া করে না।

পরিবারের বড়দের সঙ্গে জঙ্গলে যায় বনজ সম্পদ সংগ্রহ করতে। মেয়েরা ছোট সংসারের দায়িত্ব নেয়। প্রাথমিক স্তরে মাত্র ২৮% শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। ঘোষ (২০১৮) এর গবেষণা বর্তমান গবেষকের গবেষণাকে মেনে নিচ্ছে। ভারত সরকারের আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের ১৭.০৯.২০১৯ তারিখ এর অর্ডার (নং F.No. 11011/01/2019-EMRS/PVTG) অনুসারে (যা ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষ থেকে কার্যকর হয়েছে) সমস্ত Particular Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) এর শিশুরা SSA/RMSA এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নোলিখিত সুযোগ সুবিধা সমূহ পাবে-

ক) PVTGs দলের সমস্ত মানুষের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিদ্যালয়গামী বয়সের সমস্ত শিশুকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) অকালে স্কুলছুট হবার হারকে দ্রুত যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।

গ) PVTGs দের বাসস্থানের নিকটে SSA/RMSA থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও এদের জন্য (বর্তমান গবেষণায় বিরহড় শিক্ষার্থীদের জন্য) আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) বিরহড়দের এলাকাগুলিতে ঘন ঘন জন সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করে সমস্ত বিরহড় শিশুকে বিদ্যালয় মুখী করতে হবে ; বিদ্যালয়ে তাঁদের নিয়মিত উপস্থিতিকে নিশ্চিত করতে হবে এবং স্কুলছুট হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে নির্মূল করতে হবে।

ঙ) স্থানীয় এলাকার শিক্ষিত মানুষদেরকে এদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ দিতে হবে। এর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পৃথক প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারবেন তাঁদের জন্য পৃথক আর্থিক বা অন্যান্য ধরনের পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) এদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো গত উন্নয়ন করতে হবে।

ছ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার, যথেষ্ট জলের ব্যবস্থা (শৌচাগারে), উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম এবং দশম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর মুখে বিরহড় এবং অন্যান্য PVTGs রা যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয় সেগুলির অপসারণ করতে হবে এবং এদের জন্য পৃথক কোচিং ক্লাস এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) স্থানীয় মানুষদের চাহিদা এবং আদিবাসীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির প্রতি শ্রদ্ধাজানিয়ে ঐ সমস্তগুলিতে বিদ্যালয়ে ছুটি দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিতে পারে। বিদ্যালয়গুলিকেও ঐ অনুষ্ঠানগুলিতে যুক্ত করা যেতে পারে।

ঞ) স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ট) স্থানীয় ভাষায় প্রাথমিক স্তরে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আদিবাসীদের ভাষাকে সম্মান জানিয়ে ঐ সমস্ত ভাষার ব্যবহার এবং উন্নয়নের সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঠ) আবাসিক এবং অনাবাসিক সমস্ত শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ড) শিক্ষার্থীদের পুষ্টির চাহিদা পুরনের জন্য বিদ্যালয়ে সব্জি চাষ করতে হবে। এই কাজে শিক্ষার্থীদের ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে সব্জি চাষের বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির পাঠ পাবে।

নেমো (২০২৪) এর গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব ভারতের একলব্য স্কুলগুলির মধ্যে কেবল মাত্র 'রামকৃষ্ণ মিশন' পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে গুণগত মানের উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু সরকার

পরিচালিত একলব্য স্কুলগুলির অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। মনে রাখতে হবে যে, একলব্য স্কুলগুলিতে বিরহড় শিক্ষার্থীদেরও আবাসিক ব্যবস্থায় পঠন পাঠনে সুযোগ রয়েছে। মুখার্জী (২০১৪) র গবেষণাতে উঠে এসেছে যে, বিরহড় সম্প্রদায় ভুক্ত মেয়েদের জন্য সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার নীতি থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের শিক্ষার প্রতি সচেতনতার অভাব রয়েছে। কম বয়সে বিরহড় মেয়েদের বিয়ে, দারিদ্র্য, পারিবারিক নিরক্ষরতা, বিদ্যালয় থেকে পরিবারের দূরত্ব ইত্যাদির কারণে এরা বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাটুকুও সম্পূর্ন করতে পারে না। সেনগুপ্ত ও ঘোষ (২০১২), গৌদাম ও সেখ (২০১৪) এর গবেষণার ফলাফলও বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের অনুসারী।

পুরুলিয়া জেলার বিরহড় সম্প্রদায়ের কোনো গ্রামেই প্রথা বহির্ভূত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র নেই। স্বাভাবিক ভাবে বয়স্ক বিরহড় সদস্যদের এমনকি স্কুলছুট যুবক-যুবতীদের জন্য সাক্ষরতার এবং সাক্ষরতা পরবর্তী পাঠগ্রহনের কোনো ব্যবস্থা আজও হয়নি।

বিরহড় গোষ্ঠীর কোনো গ্রামেই 'মহিলা মঙ্গল সমিতি' নেই। অন্যান্য আদিবাসী মহিলারা 'Self-Help Group' এর সদস্য হলেও বিরহড় মহিলারা এই দলের সদস্য নন। স্বাভাবিক ভাবে বিরহড় মহিলারা বনজ সম্পদ সংগ্রহের বাইরে কোনো অর্থ উপার্জনের পথ জানেন না। বিরহড় মেয়ে এবং মহিলাদের উন্নয়নের জন্য তাই 'Self-Help Group' এবং 'মহিলা মঙ্গল সমিতিতে' এদের যুক্ত করা আশু প্রয়োজন।

ভারত তথা বহির্বিশ্বের সমস্ত আদিবাসী সমাজ-পাহাড়-জঙ্গল-ঝর্ণা-নদী ভিত্তিক জীবন আজও পছন্দ করেন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাহিত পরম্পরাগত দেশীয় জ্ঞানকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন, এই জ্ঞান সঞ্জাত জীবন যাপন তাঁদেরকে দেখিয়েছে স্থিতিশীল উন্নয়নের দিশা। প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত অপূর্ব ভাণ্ডারকে নষ্ট না করেও যে প্রকৃতির সম্পদের উপর নির্ভরশীল থেকে জীবন যাপন করা যায়, প্রকৃতিকে তার নিজস্ব সম্পদে মহিমান্বিত করে রাখা যায় তার প্রমান পাই আদিবাসীদের জীবন চর্চায়। আদিবাসী গোষ্ঠীর 'harmonious

relationship between human nature universe and notions of equality and complementarity' তে (Ibanez, 2010; Gudynas, 2011b). সুস্থ থাকার মৌলিক শর্তগুলি হল – পুষ্টিকর খাদ্য এবং পানযোগ্য পানীয় জলের ছেদহীন যোগান, বাসস্থান, পারস্পরিক স্নেহ-ভালোবাসা যুক্ত পরিবার এবং প্রতিবেশীদের মধ্যের বন্ধন, সুস্বাস্থ্য, স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য, সুস্থিত সমাজ এবং সংস্কৃতি, ধর্মাচরণে স্বাধীনতা, দূষণমুক্ত এবং সুরক্ষিত পরিবেশে জীবন যাপনের সুযোগ এবং জীবিকা অর্জনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা (UNPFII, 2010).

আদিবাসী মানুষরা তাদের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের সহায়তায় সুন্দর জীবন যাপনে সমর্থ যা একই সঙ্গে স্থিতিশীল উন্নয়নকে ধরে রাখতে সহায়তা করে। আদিবাসী মানুষদের দীর্ঘ প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে পাওয়া জীবন অভিজ্ঞতা তাদেরকে শারীরিক ও মানুসিক ভাবে সুস্থ থাকার পাঠ দিয়েছে (Gudynas, 2011a; Mollo, 2011; Cunningham, 2010a)।

পুরুলিয়া জেলার বিরহড় সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়নকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, বিরহড়রা-

ক) আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে সুস্থ জীবন চর্চায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কে জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা সুস্থ জীবনের প্রত্যাশী প্রকৃতি এবং বিশ্বকে সুরক্ষিত রেখে। বলিভিয়া, ইকুয়েডর, পানামা প্রভৃতি ল্যাটিন আমেরিকা ভুক্ত দেশগুলির আঞ্চলিক আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য (Gudynas, 2011b). নিকারাগুয়াতে Miskitu আদিবাসী সম্প্রদায় 'laman laka' নামে যে ধারণা পোষণ করে তাতে বলা হয়েছে যে সম্প্রদায়ের সকলে মিলে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে একত্রে বাস করবে, যে জমিটুকু চাষের জন্য ব্যবহার যোগ্য তাকে সবাই মিলে ভোগ করবে, নিজেদের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে মত বিনিময় করবে, এবং লিঙ্গ ও বয়স নির্বিশেষে সকলে পরিবার ও সমাজে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপন করবে (Cunningham, 2010a ; 2010b). ল্যাটিন আমেরিকার বাইরে ফিলিপিন্স –এ Cordillera region এর Kemkanaey Igorot উপজাতির সম্প্রদায়ের

মানুষরাও 'gawis ay biag' এর কথা বলে, যার অর্থ হোল সকলের সম্মিলিত সুস্থ সুন্দর জীবন (UNPF11, 2010). পানামা, কুয়াতে আদিবাসীরা যে 'balu wala' –র ধারণা পোষণ করে তাঁর অর্থ হল মাতৃভূমি এবং মানুষের মধ্যের সুস্থ সম্পর্ক, যেখানে মানুষ মাতৃভূমি প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

গবেষণায় বর্তমান গবেষক দেখেছেন যে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত জ্ঞান বা দেশীয় জ্ঞান বংশপরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় অপ্রথাগত ভাবে –যা প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যক্রম নয়, জীবন ব্যাপী শিখন, কাজের মধ্যে দিয়ে শিখন, নিরন্তর পর্যবেক্ষণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া- বয়স্ক মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে (UNESCO, 2009) ইত্যাদি আদিবাসী মানুষদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের একজন হিসাবে গড়ে তোলে। বই পড়ে বা কোন কোর্স করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানকে আয়ত্ত্ব করা যাবে না, কারণ এই জ্ঞান হল "living process to be absorbed and understood" (Battiste, 2002). আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেশীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ সমূহ বংশপরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে সঞ্চারিত হয়। গল্পকথা, পৌরানিক কাহিনী, জ্ঞান, নাচ, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে মুখে মুখে এই জ্ঞান ভাণ্ডার, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। (Marika et.al., 2009; Battiste, 2002). সুতরাং আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ভাষা বাঁচলে বেঁচে যাবে সংস্কৃতি, সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমূহ, ধর্মীয় রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা, প্রতীক এবং শিল্পকলা (Sillitoe, 1998; Battiste, 2002). অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেশীয় জ্ঞান প্রবাহিত হয় বংশ পরম্পরায়। দেশীয় জ্ঞানের সঞ্চালন সমান ভাবে ঘটেনা; লিঙ্গ, বয়স, অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, পেশা ইত্যাদির কারনে দেশীয় জ্ঞান একই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন হারে সঞ্চারিত হয়। এমনকি দেশীয় জ্ঞানের সঞ্চালনের গুণগত এবং পরিমাণগত মানও ভিন্ন ভিন্ন হয় (Briggs, 2005; Grenier, 1998)।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের সঞ্চালনে যদিও নারী এবং পুরুষের ভূমিকা সমান, তবুও এই বিষয়ে নারী এবং বয়স্ক সদস্যদের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে (Tebtebba, 2009)। পুরুলিয়া জেলায় বাসকারী বিরহড়দের মধ্যে দেশীয় জ্ঞান ধারার সঞ্চালনে ভালো ভাবে নারী এবং পুরুষদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝা যায়। এর কারন পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষদের কর্মবিভাজন এবং দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য। পুরুষরা জঙ্গল থেকে বনজ সম্পদ সংগ্রহ, শিকার, অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করে অর্থ উপার্জন, সমাজের সদস্য হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকে। অন্যদিকে মহিলারা জঙ্গল থেকে পাতা ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, সংসারের কাজ, শিশু এবং বয়স্কদের লালন-পালনে যুক্ত থাকে। ওষধি গাছ সংগ্রহ করার প্রধান ভূমিকা পালন করে পুরুষরা।

আদিবাসী সমাজে মহিলারা মাতৃভূমি রূপে সংজ্ঞায়িত হন। কারণ প্রকৃতি তথা পৃথিবীর ন্যায় মহিলারাও সৃষ্টি করেন প্রাণ। তাই মহিলারা আদিবাসী বিরহড় সমাজে কেবলমাত্র পরিবার তথা সমাজের ‘সেবাদাত্রী’ নন, একই সঙ্গে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান, সংস্কৃতি, জীব বৈচিত্র্য ইত্যাদির ধারক ও বাহক। অপ্রথাগত শিখনের মাধ্যমে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান, সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞা ইত্যাদি মহিলারাই সন্তান তথা পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সঞ্চারিত করেন (Howell, 2003)। প্রকৃতি তথা জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে এই জ্ঞানকে ব্যবহার করা যায়। জঙ্গলে কোথায় কি গাছ রয়েছে, ঐ গাছ থেকে খাবার কি ভাবে সংগ্রহ করা যাবে, বর্ষাকালে যখন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করা যাবে না তখনকার খাবারের সংস্থান পূর্ব থেকে টাণ্ডার মধ্যে করে রাখার ন্যায় কাজের দায়িত্ব বিরহড় মহিলাদের উপর বর্ত্তায়। আফ্রিকাতেও আদিবাসী মহিলারা একই রকম দায়িত্ব পালন করেন (Ramphele, 2004)। সুতরাং ভারত এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে আদিবাসী মহিলারা স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে আদিবাসী সমাজের অভ্যাস, প্রথা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সঞ্চারিত করেন। জঙ্গলকে বাঁচাতে এবং জঙ্গলের জীব বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখতে আদিবাসী মহিলাদের বিশেষত বিরহড় সম্প্রদায়ের

মহিলাদের অবদান সর্বাধিক - যেহেতু তাঁরা জানেন জঙ্গলের কোন গাছ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কোন সময়ে গাছটির কোন অংশ এবং কতটাকে সংগ্রহ করা যাবে, যাতে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও জঙ্গলের জীব-বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখা যাবে (Pradhan et.al. 2011)।

পরিবারের উন্নয়নে আদিবাসী মহিলা ও পুরুষদের দায়িত্ব প্রায় সমান সমান থাকায় আদিবাসী মহিলারা নিজেদেরকে মূল্যহীন বা পৃথক বলে চিহ্নিত করেন না। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় উঠে এসেছে ভিন্ন তথ্য। যেমন সামাজিক এবং রাজনৈতিক আলোচনা সভায় আজও বিরহড় সমাজের মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রায় অনুপস্থিত। তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানভাণ্ডার সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবার কমই সুযোগ পায় (Rocheleau, 1991), তাঁদের কাজ যথেষ্ট মূল্য পায় না (Gururani, 2002), সর্বসমক্ষে তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। শুধু বিরহড় সমাজে নয়, অন্যান্য আদিবাসী সমাজেও মহিলাদের অভিজ্ঞতা প্রায় একই প্রকারের। আদিবাসী সমাজে মহিলাদের ক্রমহ্রাসমান গুরুত্ব তাঁদের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানকে নষ্ট হতে দেয় - যা আদিবাসী সমাজ এবং আধুনিক সমাজের পক্ষে বিপদ সংকেত আনছে সন্দেহ নেই। কোন কোন গবেষক এর কারণ হিসাবে আদিবাসী মহিলাদের প্রথাগত শিক্ষার অভাব এবং সমাজের একজন সম্মানিত সদস্য হিসাবে অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত থেকে বঞ্চিত থাকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন (Schmink & Gomez-Garcia, 2015)। নারী এবং পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ ভিত্তিক সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশীয় জ্ঞান এবং উত্তরাধিকারকে বংশপরম্পরায় সঞ্চালিত করা অসম্ভব- ফলে পর্যায়ক্রমে ঘটবে দেশীয় জ্ঞানের ধ্বংস সাধন। তাই আদিবাসী মহিলাদের ও সামাজিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্ত কাজকর্মে যথেষ্ট সম্মান এবং গুরুত্ব সহকারে যুক্ত করতে হবে।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের ন্যায় স্থিতিশীল উন্নয়নে দেশীয় জ্ঞান বংশ পরম্পরায় সঞ্চালনে বয়স্কদের গুরুত্বও অপরিসীম (Dweba & Mearns, 2011)। বয়স্ক বিরহড়রা পূর্বপুরুষদের থেকে বংশপরম্পরায় যে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং নিজস্ব অর্জিত অভিজ্ঞতাকে একত্রে সংশ্লেষণ করে

উত্তরপুরুষদের হাতে সঞ্চারিত করেন। গল্প, কথকতা, গান-ছড়া, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে বয়স্ক বিরহড় সদস্যরা তাঁদের অর্জিত দেশীয় জ্ঞানের উত্তরাধিকারকে নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেন। চিরাচরিত ভাবে এই প্রথা থাকলেও বর্তমান নতুন প্রজন্মের বিরহড়রা পূর্বপুরুষ এবং বয়স্ক সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের আহরণে এবং তার প্রয়োগে অনীহা প্রকাশ করছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণাতেও এই একই অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে (Posey, 1990 ; Ohmagori & Berkes 1997 in Canada ; Rocheleau, 1991 in Kenya)। এবং অন্যান্য গবেষকরা (Rocheleau, 1991 ; Odora Hoppers, 2001) লক্ষ্য করেছেন যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথাগত বিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তনের কারণে নতুন প্রজন্মের মধ্যে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের প্রতি অবহেলা এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রতি অনীহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং দেশীয় জ্ঞানের গুরুত্ব বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করলে এই সমস্যার অনেকাংশে সমাধান সম্ভব।

৭.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য (Significant of present Research in Education):

সমগ্র বিশ্বেই দেখা যাচ্ছে যে প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষা আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, ধর্ম বিশ্বাস, চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান এবং তার ব্যবহার, স্থিতিশীল উন্নয়নের পক্ষে। UNESCO (2009) এর মতে প্রতিষ্ঠানিক প্রথাগত শিক্ষা আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি সহায়কও বটে। আদিবাসী ছেলে মেয়েরা অপ্রথাগত পদ্ধতিতে পরিবার এবং পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি লাভ করে - যা তাদেরকে আদিবাসী সমাজ ও পরিবেশে উপযুক্ত ভাবে মানিয়ে চলতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রবেশ করে আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীরা ভুলে যাচ্ছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, প্রথা এবং মূল্যবোধকে। তাদের কাছে গুরুত্ব হারাচ্ছে মা এবং প্রকৃতিরূপী মা। চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান তাদের কাছে অশিক্ষিতদের অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। স্থিতিশীল উন্নয়নের বদলে তারা স্বপ্ন দেখে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং স্থিতিশীলতার। প্রতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তারা নিজের গ্রামে ফিরে যায় না, নিজস্ব পরব এবং সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেনা বা যোগ দিতে তাদের মন চায়না। ধীরে ধীরে নিজস্ব মাতৃভাষাও এই সব পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতরা ভুলতে থাকে। এই সব ছেলে মেয়েরা নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে গিয়েও অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চজাতির সঙ্গেও বিয়ে করে।

প্রথাগত শিক্ষায় আদিবাসীরা প্রবেশ করার পর সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের ভাষা এবং দেশীয় জ্ঞান দ্রুত হারে নষ্ট হয়ে চলেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুর দুয়ার জেলায় বসবাসকারী অধিকাংশ অসুর গ্রামের মানুষজন তাদের নিজস্ব ভাষা আসুরী ভাষা একেবারেই ভুলে গেছে-কেউ আর আসুরী ভাষায় কথা বলে না। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী কোড়া উপজাতির অধিকাংশ গ্রামে কেউ আর কোড়া ভাষায় কথা বলে না।

প্রথাগত শিক্ষার নাগপাশে বন্দী হয়ে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে আবাসিক বিদ্যালয়ের আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা (Ohmagari & Berkes, 1997) বোডিং স্কুলের আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা (Reyhner & Eder, 2015) অথবা মেসবাড়ি থেকে লেখাপড়া করা (Armitage, 1995) আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীরা তাঁদের সম্প্রদায়ের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়েছে ; এবং সঙ্গে হারিয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ বন্ধন, রীতিনীতি, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য। আদিবাসীরা নিজস্ব ভাষা হারালে হারিয়ে যায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং দেশীয় জ্ঞান। কারণ দেশীয় জ্ঞান ধরা রয়েছে আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায়। একথা আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী সমাজ যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই সারা বিশ্বের ভবিষ্যতের পক্ষে

মঙ্গলজনক হবে। এই প্রসঙ্গে Stavenhagen (2015) এর বক্তব্যটি বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য – আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের তাঁদের পরিবার, পরিবেশ এবং সংস্কৃতি থেকে পৃথকীকৃত করলে তা সৃষ্টি করবে "irreparable harm to the survival of indigenous cultures and societies" (p.255)।

Stavenhagen (2015) এর কথা মনে রাখলে ভারতে প্রতিষ্ঠিত একলব্য স্কুল, বনবাসী আশ্রমিক স্কুল, নবোদয় বিদ্যালয়, আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়াবে।

বর্তমানে পাশ্চাত্যের একীভূত বা অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের একই সঙ্গে পাঠদান করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আদিবাসীদের জ্ঞান এবং তার প্রয়োগকে প্রথাগত শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অঙ্গীভূত করা হচ্ছে, যাতে আদিবাসীদের অর্জিত চিরাচরিত পরম্পরাগত দেশীয় জ্ঞান ভাণ্ডার নষ্ট না হয়ে সুরক্ষিত থাকে এবং এই বিষয়ে নিরন্তর জ্ঞানচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এই একই কথা ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। নিরন্তর চর্চার মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতিকে। আদিবাসী ভাষা, সংস্কৃতি, চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানকে কোন অবস্থাতেই ছোট করা যাবে না। শিক্ষক শিক্ষিকাদের ও এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অন্যথায় আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞান, মূল্যবোধ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে শিক্ষকরা ইতিবাচক মনোভাব সহকারে বিশ্লেষণ এবং গ্রহণ করতে পারবেননা (Radoll, 2015 ; Nakashima et.al., 2012)। অন্যদিকে Odora Hoppers, (2001, p.18) এর ভাষায়, "every time a child enters the gates of the school, the spontaneous process of that symbolic fumigation, cosmological cleansing, and mandated acculturation begins".

চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের চর্চা হ্রাস পেলে বা ধ্বংস হলে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাবে, বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরার হার কম হবে, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত মানের অবনতি ঘটবে অ-আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায়। প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত এই কথা সমান ভাবে

প্রযোজ্য। অস্ট্রেলিয়াতে দেখা গেছে, অ-আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা গনিত, বিজ্ঞান এবং পঠনের ক্ষেত্রে অন্তত ২.৫ বৎসর পিছিয়ে থাকে (Dreise & Thomson, 2014)। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পেরুতেও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সমবয়সী অ-আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় গনিত এবং বানানে পিছিয়ে থাকতে (Arteaga & Glewwe, 2014) দেখা যায়।

শিক্ষক, পাঠক্রম প্রণেতা এবং পলিসি রচনাকারীদের এই ব্যাপারে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। আদিবাসী ছেলে মেয়েদের অর্থপূর্ণ এবং কার্যকারী পাঠদান করতে হলে আদিবাসী সমাজ থেকে অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় এবং পলিসি রচনায় সক্রিয় ভাবে যুক্ত করতে হবে।

প্রতিটি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আদিবাসী চর্চাকেন্দ্র' স্থাপন করে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এবং পেশাদার ব্যক্তিদের এই কেন্দ্রের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। নিরন্তর গবেষণা এবং আদিবাসী চর্চাকে প্রথাগত শিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এছাড়াও আদিবাসীদের বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা ভিত্তিক বই প্রকাশ করতে হবে যাতে সাধারণের মধ্যে আদিবাসীদের সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি হয় এবং আদিবাসীদের প্রতি সর্বসাধারণের মনোভাব ইতিবাচক হয়।

একই সঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আদিবাসী চর্চাকে একটি পূর্ণাঙ্গ অবশ্য পাঠ্যপত্র হিসাবে যুক্ত করতে হবে এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.৪ পরবর্তী গবেষণার সুযোগ (Opportunities for Further Research):

১) বর্তমানের বিশ্বায়ন, পাশ্চাত্তীকরণ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদির প্রবল ধাক্কায় চিরাচরিত জীবনে খুশি থাকা আদিবাসীরা কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তার থেকে আশু ও দীর্ঘস্থায়ী মুক্তির পথ খুঁজে বার করা।

২) বনবাসী আবাসিক আশ্রম বিদ্যালয়, একলব্য স্কুল, নবোদয় বিদ্যালয়, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও মিশন পরিচালিত আদিবাসীদের বিদ্যালয়ের পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন, ছুটির সময় তালিকা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা।

৩) আদিবাসী চর্চা কেন্দ্রগুলির গবেষণার আশু এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করা।

৪) আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষার সুযোগ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ভাষা ও লিপি বিষয়ে গবেষণা করা।

৫) আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৭.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Research):

১) বর্তমান গবেষণায় গবেষক কেবলমাত্র বিরহড় সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করেছেন।

২) PVTGs এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় ছাড়াও লোধা এবং টোটো উপজাতি রয়েছে, গবেষক দক্ষিণবঙ্গের লোধাদের সঙ্গে বিরহড়দের তুলনামূলক আলোচনা করেননি।

৩) বিরহড়দের উপর গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ছাড়াও অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমিতে বাসকারী বিরহড়দের গবেষণায় যুক্ত করা হয়নি।

৪) বিরহড় সম্প্রদায়ের আর্থ–সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ে কোন পি.এইচ.ডি./এম.ফিল. স্তরের গবেষণা বর্তমান গবেষকের নজরে আসেনি। যথেষ্ট গবেষণা পত্র ও প্রকাশিত হয়নি। তাই গবেষক খুব বেশি সংখ্যক গবেষণা পত্রের পর্যালোচনার সুবিধা পাননি।

৫) উপযুক্ত সহায়ক ব্যবস্থার অভাবে গবেষক যথেষ্ট সংখ্যক চিত্র এবং ভিডিও তুলে ধরতে পারেননি।

গ্রন্থপঞ্জী

(BIBLIOGRAPHY)

About the Region-Damodar Basin, Ministry of Environments and Forests. (http://envfor.nic.in/divisions/cltech/damodar/1.1.htm). 2007-09-27. Retrieved 2008-05-25.

Archived from the original on 7 January 2013, Retrieved 2 April 2012 (https://web.archive.org/web/20130107202215/http://www.tribalzone.net/people/jaipalsingh.htm).

Archived from the original. (http://www.cityofmine.in/history-tradition-culture-heritage-tourism-festivals-of-purulia). On 4rth November 2012. Retrived 17 January 2013.

Armitage, A. (1995). *Comparing the Policy of Aboriginal Assimilation: Australia, Canada, and New Zealand*. Vancouver: University of British Columbia Press. Available at: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED403094.pdf

Arteaga, I., & Glewwe, P. (2014). Achievement Gap between Indigenous and Non-Indigenous Children in Peru: An analysis of Young Lives Survey Data. *Young Lives Working Paper 130.* at:http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/Younglives/wp130_arteaga_learning-gaps.pdf

Bahadur, K. P. (1977). *Bengal, Bihar and Orisha: Casete, Tribes, and Culture of India.* Vol-III. Ess ess publication, Delhi. pp.13-14

Battiste, M. (2002). *Indigenous Knowledge and Pedagogy in First Nations Education:* A Literature Review with Recommendations. Ottawa: Apamuwek Institute.

Best, J. W., & Kahn, J. V. (2006). *Research in Education.*Tenth Edition, Pearson Education, Inc.

Briggs, J. (2005). The use of indigenous knowledge in development: problems and challenges. *Progress in Development Studies*, 5(2), 99-114. Available at: http://eprints.gla.ac.uk/1094/1/JBriggs_eprint1094.pdf

Brim, J. A., & Spain, D. M. (1974). *Research Design in Anthropology: Paradigms and Pragmatics in the Testing of Hypotheses.* New York: Holt, Rinehart & Winston.

Carruthers, I., & Chambers, R. (1981). Rapid Appraisal for Rural Development. *Agricultural Administration,* 8(6), pp.407-422.

Census of 1951, Government of India.

Census of 2011, Government of India.

Census report 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, British Government of India.

Census Report 2001, Government of India.

Census Report 2011, Government of India.

Chambers, R. (1980). "Rapid rural appraisal: Rationale and repertoire", *IDS Discussion Paper,* No. 155 Brighton: IDS. University of Sussex. September.

Chambers, R. (1993). *Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development.* London: Intermediate technology Publication.

Chattopadhyay, A. Bardhaman Jelar Litihas O Loke Snaskriti (History and Folk Lore of Bardhaman District.) (In Bengali), pp. 21-26, ISBN 81-85459-36-3.

Concise Oxford English Dictionary, (2007).

Conway, G. (1985). "Agroecosystem analysis". *Agricultural Administration,* Vol. 20, pp.31-35.

Conway, G. (1986). *Agroecosystem Analysis for Research and Development* (India: Winrock International Institute for Agricultural Development).

Conway, G. (1987). "Rapid rural appraisal and agroecosystem analysis: A case study from Northern Pakistan", in KKU, *Proceedings of the 1985 International Conference on Rapid Rural Appraisal.* System research and Farming Systems Research Projects. Khon Kaen, Thailand: University of Khon Kaen, pp.228-254.

Creswell. J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions.* London: Sage.

Cunningham, M. (2010 a). Acerca de la vision del "buen vivir" de los pueblos indigenas en latinoamerica. *ASUNTOS INDIGENAS*, 1-2 (10), 52-55.

Cunningham, M. (2010 b). Laman laka: Our Indigenous Path to Self-Determined Development. In Tauli-Corpuz, V., Enwike-Abayao, L., & de Chavez, R. (Eds.) *Towards an Alternative Development Paradigm: Indigenous Peoples' Self-Determined Development.* Philippines, Tebtebba Foundation.

Dalton, E. T. (1872). *Descriptive Ethnology of Bengal.* Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta. p.208

Dalton, E. T. (1872). *Descriptive Ethonology of Bengal, Calcutta.* Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta.

Damoder Valley (https://web.archive.org/web/20070927182506).

Das Basu, D., Roy, S. R., Nandi, A.K., & Sen Gupta, S. P. (2007). *Case Book on India Constitutional Law.* Kamal Law House, Kolkata. P. 961.

District Census Handbook Puruliya, Census of India 2011, Series 20, Part XII A. *Table 33: Distribution of Workers by Sex in Four Categories of Economic Activity in Sub-district 2011. Directorate of Census Operations, West Bengal.*

DistrictCensus Handbook: Purulia. General and Census Commissioner of India. 2011.

Dreise & Thomson (2014). Details not found.

Dweba, T. P., & Mearns, M. A. (2011). Conserving indigenous knowledge as the key to the current and future of traditional vegetables. *International Journal of Information Management,* 31(6), 564-571.

Fobers, L. R. (1872). *Report on the Rawati Settlement of the Government Farms in Palamou.* Calcutta: Government Printing Press.

Freire, P. (1968). *Pedagogy of the Oppressed.* New York: The Seabury Press.

Fuchs, S. (1973). *The Aboriginal Tribes of India.* The Macmillian Company of India Ltd, New Delhi, p.172

Ghosh, S. (2018). Impact of Different Development Programmes on the Scheduled Tribe People in West Bengal- Case Study on Birhor Community. *Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika,* 5(11), 182-185.

Gilbert, E. H., Norman, D. W., & Winch, F. E. (1980). *Farming Systems Research: A Critical Appraisal.* MSU Rural Development Paper No. 6, East Lansing: Department of Agricultural Economics, Michigan State University.

Goudam, S., & Sekh, T. V. (2014). Factors Leading to School Drop-Outs in India: an Analysis of National Family Health Survey-3 Data. *Journal of Research & Method in Education*, 4, 2320-7388. November–December. www.iosrjournals.org

Grenier, L. (1998). *Working with indigenous knowledge: A guide for researchers.* Ottawa: International Development Research Center.

Gudynas, E. (2011b). Buen vivir: Germinado alternativas al desarrollo. *America Latina en Movimiento*, 462, 1-20.

Gudynas, E. (2011a). Buen vivir: today's tomorrow. *Development,* 54 (4), 441-447.

Gudynas, E. (2011b). Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. *America Latina en Movimiento,* 462, 1-20.

Guha, R. (2008). *India after Gandhi: the History of the World's Largeste Democracy.* ISBN: 978-006095858-9.

Guha, S., & Ismail, M. D. (2015). Socio-Cultural Change of Tribes and their Impacts on Environment with Special Reference to Santal In West Bengal. *GJISS*, 4(3), 148-156.

Gururani, S. (2002). Le savoir des femmes du tiers monde le discours sur le development, *Revue international des sciences sociales,* 54(173), 353-363. Available at: www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2002-3-page-353.htm.

Gypmantasiri et al., (1980). *An Interdisciplinary Perspective of Cropping System in the Chiang Mai Valley: Key Questions for Research.* Thailand: Multiple-Cropping project. Faculty of Agriculture, University of Chiang Mai.

History of Purulia, Bharatonline.com. Retrived 17Th January 2013 (http://www.bharatonline.com/west-bengal/travel/purulia/history.html).

History, Tradition, Culture, Heritage, Tourism & Festivals of Purulia (https://web.archive.org/web/20121104150746/).

Howell, P. (2003). *Indigenous early warning indicators of cyclones: potential application in coastal Bangladesh.* London: Benfield Greig Hazard Research Centre. Available at: http://www.unisdr.org/files/1529_workingpaper6.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/baghmundi

https://en.wikipedia.org/wiki/Balarampur,_Purulia_(community_development_block)

https://en.wikipedia.org/wiki/jhalda_I

Hunter W.W. (1997). A statistical account of Bengal. West Bengal District Gazetters. W.B. Government, pp.9,133,134.

Hunter, W.W. (1876). *A Statistical Account of Bengal*. Vol-VII. District of Maldah, Rangpur and Dinajpur, Trubner & co, London, Pp381-382.

Ibanez, A. (2010). Un Acercamiento al buen vivir. Producto Del Taller "La educacion popular en la lucha por el buen vivir", San Salvador. *Consejo de Educacion de Adultos de America Latina.*

Khubchandani, L. M. (1992). *Tribal Identity-A Language and Communications Perspective.* Indian Institude of Advance Study, Shimla. p.350

Lokur Committee (1965). Department of Social Security, Government of India, p7.

Longhurst, R. (1981). Rapid Rural Appraisal. *IDS Bulletin,* 12(4).

Marika, R., Yunupingu, Y., Marika-Mununggiritj, R., & Muller, S. (2009). Leaching the Poison-The Importance of Process and Partnership in Working with Yolngu. *Journal of Rural Studies*, 25 (4), 404-413.

McMillan, J. H., & Schumaches, S. S. (1997). *Research in Education: A Conceptual Indroduction*. Longman, New York. p.469.

Ministry of Tribal Affairs, Government of India, 2014.

Ministry of Tribal Affairs, Government of India, 2014.

Mollo, E. C. (2011). El vivir bien, una propuesta de los pueblos indigenas a la discusion sobre el desarrollo. *OBETS, Revista de Ciencias Sociales*, 1(6), 19-34.

Mukherjee, (2014). Status of Female Education among Santal, Kheria, Sabar and Birhor Tribal Communities of Purulia District, West Bengal, India. *Transactions Indian Geographers,* 36 (2), 271-278.

Mukhopadhyay, L. (2002). *Tribal Women Development.* Publication Divisions, Ministry of Informative and Broadcasting Government of India, New Delhi. P.133

Mukhopadhyay, L. (2002). *Tribal Women in Development.* Publication Divisions, Ministry of Informative and Broadcasting, Government of India, New Delhi. p.133

Nakashima, D. J., Galloway McLean, K., Thulstrup, H. D., Ramos Castillo, A., & Rubis, J.T. (2012**).** *Weathering uncertainty: traditional knowledge for climate change assessment and adaptation*. Paris UNESCO and Darwin: UNU.

Nemo, P. (2024). Tribal Education in Eastern India with Special Reference to Eklavya Model Residential Schools. Ph. D. Thesis (unpublished) in Educational Studies, University of Calcutta.

Odora Hoppers, C. A. (2001). Indigenous Knowledge Systems and Academic Institutions in South Africa. *Perspective in Education*, 19(1), 73-85.

Ohmagari, K., & Berkes, F. (1997). Transmission of indigenous knowledge and bush skills among the Western James Bay Cree women of subarctic Canada. *Human Ecology*, 25(2), 197-222.

Posey, D. (1990). Intellectual property rights: and just compensation for indigenous knowledge. *Anthropology Today*, 13-16.

Pradhan, S., Mishra, S., & Mohapatra, S. C. (2011). Food practices among the adivasi women of selected district, Western Orissa. *Indian Journal of Preventive and Social Medicine,* 42(3), 226-230.

Radoll, P. (2015). Aboriginal peoples, education and information and communication technologies in Australia. In Bidwell, N. J., & Winschiers-Theophilus, H. (eds). *At the intersection of indigenous and traditional knowledge and technology design.* Santa Rosa: Informing Science Press.

Ramphele, M. (2004). Women's indigenous knowledge: Building bridges between the traditional and modern. In The World Bank. (Ed). *Indigenous Knowledge: Local Pathways to Global Development. Knowledge and Learning Group.* Washington D.C.: The World Bank.

Reyher, J., & Eder, J. (2015). *American Indian Education: A History*. Oklahoma: University Of Oklahoma Press.

Risley, H. H. (1892). *The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary.* Vol-Ii. The Bengal Secretariat Press, Calcutta. p. 232.

Risley, H. H. (1892). *The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary.* Vol-II. The Bengal Secretariat Press, Calcutta. pp. 224-225

Risley, H. H. (1892). *The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary.* Vol-II. The Bengal Secretariat Press, Calcutta. pp.68-70

Rocheleau, D. E. (1991). Gender, ecology, and the science of survival: Stories and lessons from Kenya. *Agriculture and Human Values*, 8(1-2), 156-165.

Roy, S. C. (1925). *The Birhors: a Little Know Jungle Tribe of Chotonagpur*. Ranchi: Man in India Office.

Roy, S. C. (1925). *The Birhors: a Little Know Jungle Tribe of Chotonagpur.* Ranchi: Man in India Office.pp.90-92.

Sabharwal, L. R., I. F.S., Conservator of Forests, Bihar, notes as part of appendix IV to report of the Damodar flood enquiry committee (1943). Republished in Rivers of Bengal, a compilation, 2002, p. 236, West Bengal District Gazeteers, Government of West Bengal.

Saren, G. (2013). Impact of Globalization on the Santals: A Study on Migration in West Bengal, India. *IJHSSI*, 2(7), 29-33.

Schmink, M., & Gomez-Garcia, M. A. (2015). Under The Canopy: Gender and Forests in Amazonia. *Center for International Forestry Research (CIFOR),* Occasional Paper No. 121.

Sen Singh, D (2018). The Indian Rivers: Scientific and Socio-Economic Aspects. *Singapore: Springer Hydrogeology. P.259.*

Sengupta, S., & Ghosh, S. (2012). Problems of Education among the Scheduled Tribes in India: Finding a Balance. *Geo-Analyst*, 2(1).

Sengupta. J. C. (1965). *West Bengal District Gazetteer, West Dinajpur.* Sree Swaraswaty Press Ltd., Calcutta.

Shaner, W. W., Philipp, P. F., & Schmehl, W. R. (1982). *Farming System Research and Development: Guidelings for Developing Countries.* Boulder, CO: Westview Press.

Sillitoe, P. (1998). The development of indigenous knowledge: a new applied anthropology. *Current Anthropology*, 39 (2), 223-252.

Sing, K.S. (2012). *The Scheduled Tribes.* Oxford University Press, New Delhi, Pp.104-106.

Sing, K.S. (2012). *The Scheduled Tribes.* Oxford University Press, New Delhi, pp.714-716

Singh, A. K. (2006). Metal Working Fluids from Vegetable Fluids. *Journal of Synthetic Lubrication,* 123, 167-176. http://dx.doi.org/10.1002/jsl.19

Stavenhagen, R. (2015). Indigenous Peoples' Rights to Education. *European Journal of Education,* 50(3), 254-257.

Stavenhagen, R. (2015). Indigenous Peoples' Rights to Education. *European Journal of Education,* 50(3), 254-257.

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory. Procedures and Techniques.* Thousand Oaks, CA: Sage.

Tebtebba Foundation. (2009). *Asia Summit on Climate Change and Indigenous Peoples.* 24-27 February 2009. Bali: Indonesia. 5-27.

Troisi, J. (1979). *Tribal Religion, Religious Beliefs and Practices among the Santals.* Monohar Publications, New Delhi. p.26

UNESCO. (2009). *Learning and Knowing in Indigenous Societies Today.* Paris: UNESCO.

UNPFII (April, 2010). Ninth Session E/C.19/2010/CRP.425. The Human Development Framework and Indigenous Peoples' Self-Determined Development with Culture and Identity. 19-30 April, 2010. New York: United States.

Vidyarthi, L.P., & Rai, B. K. (1985). *The Tribal Culture of India.* New Delhi: Concept Publishing Company.

West Bengal Summary. *Rural Household Survey 2005. Department of Panchayat & Rural Development, Government of West Bengal. Archived from* the original *on 13 January 2020.*

West Bengal: Poverty, Growth and Inequality, *World Bank Group. Retrieved 11* January 2020.

Xaxa, V. (2008). *State, Society and Tribes-Issues in Post Colonial India-Pearson.* Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd. Pearson Education in South Asia.

ভট্টাচার্য, পরিমল (২০১৯)। সত্যি রূপকথা / *সভ্যতা উন্নয়ন ও উড়িষ্যার এক উপজাতির জীবন সংগ্রাম।* অবভাস (তৃতীয় মুদ্রণ), প্রিস্থা.৭৯-৮০ ।বিবর্ণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুশ্রী. *ভারতবর্ষের আত্ম পরিচয় (পূর্ব).* ভারত চিন্তাঃ ভারতের স্বরূপ সন্ধান। পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান. (২০১২). *প্রসঙ্গ আদিবাসী.* Concept Publishing Company Private Limited, New Delhi.

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ. (১৯৮৭). *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড).* প্রকাশনায় শ্রীমতী রিঙ্কি বাস্কে, শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা.

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ (১৯৩৯), *'আরণ্যক'।* কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা, পৃষ্ঠা.১৭৫।

সেন, সলিল (১৯৫৩)। *নতুন ইহুদি।* ইন্ডিয়ানা, কলকাতা, পৃষ্ঠা.৬৫।

ঘোষ, সুবোধ (১৯৪৮), *ভারতের আদিবাসী।* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা.৩১১।